পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

পরমহংসদেব

(শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কথা)

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

ফাল্গুন, ১৩৩৩

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা
১নং মুখার্জি লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩১।২৭

নিবেদন

এই পুস্তকের সমস্ত সত্ত্ব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননীর পুণ্যস্মৃতি-মন্দির কল্পে উৎসৃষ্ট হইল।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' ও পরম ভক্তিভাজন শ্রীম লিখিত 'কথামৃত' হইতে এই গ্রন্থের সারাংশ সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের নিকট লেখকের ঋণ অপরিমেয়।

কাম-কাঞ্চন-কীট গৃহীর পক্ষে সর্ব্বত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত চরিত্র ও পবিত্র জীবন-কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার প্রয়াস—পঙ্গুর পর্ব্বত-লঙ্ঘনের অভিলাষ। তৎসম্বন্ধে অনধিকারী লেখকের কেবল এইমাত্র বলিবার আছে—

দেবদূত ভীত যথা, অনায়াসে পশে তথা—
কাণ্ডজ্ঞানহীন মূঢ় জন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু



ঈশানকোণে অবস্থিত পুষ্করিণীর পাড় হইতে ৺খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কামারপুকুরের কুটীর।

ঠ
৪৬৭

পরমহংসদেব

(১)

যে পুরুষোত্তমের পবিত্র প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইতেছে, হুগ্‌লী জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত কামারপুকুর গ্রাম তাঁহার জন্মভূমি। এই পুণ্যভূমির মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হইলে দেখা যায় যে, তাহার উত্তর-পূর্ব্ব ও উত্তর-পশ্চিম দুই কোণে 'ভূতির খাল' ও 'বুধুই মোড়ল' নামে দুই মহাশশ্মান—জীবনের করুণ পরিণাম অস্থি-ভস্মে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, আর অদূরে অগ্নিকোণে গড়মান্দারণের ভগ্ন স্তূপ ঐশ্বর্য্য-গৌরবের নশ্বরতা নীরবে কীর্ত্তন করিতেছে। কিন্তু বিবেক-বৈরাগ্য-উদ্দীপক এই সকল দৃশ্য বিদ্যমান থাকিতেও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান অতীব রমণীয়। গ্রামখানি ঘন-পল্লব-সমাচ্ছন্ন এবং স্নিগ্ধচ্ছায়া-নিবিড়। ইহার উত্তরপ্রান্ত দিয়া 'ভূতির খাল'—ক্ষুদ্র পয়োধারা—ক্ষীণ রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে আমোদর নদে মিলিত হইয়াছে। এই পয়োপ্রণালীর অঙ্কশায়িত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বায়ুকোণস্থিত শ্মশান 'ভূতির খাল' নামে অভিহিত। এই শ্মশানের পশ্চিমে দিগন্তবিস্তৃত গোচর-ভূমি। সেই গোচারণ-স্থানের ক্রোড়দেশে বিশাল আম্রবন—হরিৎ সাগরে নীল দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান। গ্রামের অভ্যন্তরে কোথাও মৃণালজাল-বেষ্টিত দীর্ঘ দীর্ঘিকা মন্দপবনে মৃদু-মন্দ দুলিতেছে। কোনখানে লতার বেষ্টনে দুই

চারিটী তরু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছে। এখানে জীবনসংগ্রামের কর্কশ কোলাহল নাই ; ভৃঙ্গের নিরন্তর গুঞ্জনে, বিহঙ্গের অবিরাম কূজনে, সঞ্চরণশীল পবনের নিরবচ্ছিন্ন তরতর-মরমর রবে গ্রামখানি যেন পুণ্য তপোবনের ন্যায় নিয়ত মন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

পল্লীদেবীর এই নিভৃত শান্তি-নিকেতনে এক ঋষিপ্রতিম ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ত্যাগ, বৈরাগ্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, সদাচার, সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, সরলতা প্রভৃতি গুণে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন। গৃহদেবতা রঘুবীরের পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না এবং জীবনে কখন শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই।

কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী দেরে গ্রামে ক্ষুদিরামের পূর্ব্ববাস ছিল। উক্ত গ্রামের জমিদার একসময় এক প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা মোকদ্দমার সূচনা করিয়া ক্ষুদিরামকে নিজ পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরাম এই অসঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিলে, জমিদারের কোপে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। পৈতৃক বাস হইতে বিতাড়িত হইয়া বিপন্ন ব্রাহ্মণ কামারপুকুরে উঠিয়া আসিলেন। এখানে ক্ষুদিরামের এক সহৃদয় বন্ধু তাঁহাকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়া এক বিঘা দশ ছটাক জমি দান করেন। ধর্ম্মপ্রাণ, সত্যনিষ্ঠ, সদাসন্তুষ্ট-চিত্ত ব্রাহ্মণ এই সামান্য সম্বলের উপর নির্ভর করিয়া নূতন স্থানে নূতন সংসার পাতিলেন।

কথিত বন্ধু ক্ষুদিরামকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহার

নাম 'লক্ষ্মী-জলা'। ক্ষুদিরামের অশেষ পুণ্যে সত্য সত্যই তাহা লক্ষ্মীর ন্যায় বরদা হইয়াছিল। এই অঙ্গুলিপরিমাণ ভূমি কামধেনুর ন্যায় অশেষ দানশক্তিশালিনী। ইহার সুপ্রচুর শস্যে রঘুবীরের সেবা, ক্ষুদিরামের সংসার এবং অতিথি-সৎকার সমস্তই স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইত।

এই দরিদ্র গৃহস্থের নিত্য-নিয়মিত ধর্ম্ম ছিল গৃহদেবতার সেবা, কর্ম্ম—অতিথি-সৎকার, এবং এই পুণ্যব্রত পালনে ক্ষুদিরামের সহধর্ম্মিণী চন্দ্রমণি দেবী তাঁহার অনন্যসহায়-স্বরূপা ছিলেন। অক্লান্তকর্ম্মিনী, অকাতর শ্রমশালিনী চন্দ্রাদেবী সংসারাশ্রমের এই পরম ধর্ম্মপালনে কখন অনুমাত্র ত্রুটি বা তাচ্ছিল্য করিতেন না। এই পুণ্য এবং দৈন্যের সংসারে অতিথি কখন বিমুখ হয় নাই। পথের পাশে কুটীর বলিয়া তাহাতে অভ্যাগতেরও অভাব ছিল না। কতদিন এমন হইয়াছে, চন্দ্রাদেবী অতিথির জন্য পুনঃ পুনঃ রন্ধন করিয়াছেন, অবশেষে অপরাহ্ণে আপনার মুখের অন্ন ক্ষুধিতকে ধরিয়া দিয়া আপনি সন্তুষ্ট চিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন। কাহারও শুষ্ক মুখ দেখিলে চন্দ্রাদেবীর মাতৃহৃদয় স্নেহ-করুণায় উথলিয়া উঠিত। বর্দ্ধমান হইতে পুরী যাইবার পথের উপর কামারপুকুর অবস্থিত। অসমর্থ যাত্রীগণকে এই পথই অবলম্বন করিতে হইত—বিশেষতঃ রথযাত্রার সময়। নিদাঘের সেই তপ্ত দিনে চন্দ্রাদেবীর চক্ষু তাঁহাদের কুটীরসংলগ্ন পথে নিয়ত সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিত। কাহাকে অভুক্ত মনে হইলে তিনি তাহাকে নানা সাধ্যসাধনায় গৃহে আনিয়া যত্নপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিতেন। সেই আষাঢ়ান্ত বেলায় সারাদিনের আতপক্লিষ্ট

ক্ষুধিত পথিক পিপাসাশুষ্ক কণ্ঠে দুইটী শীতল পরিষ্টি-ভাত ও স্বচ্ছন্দলব্ধ সুশুনি শাকের ব্যঞ্জন খাইয়া যে অমৃতের আস্বাদ করিত, তাহা রাজভোগেও বিরল। অপার করুণারূপিনী, মাতৃহৃদয়া এই নারী গ্রামে কেহ অভুক্ত আছে মনে হইলে মুখে অন্নের গ্রাস তুলিতে পারিতেন না। পবিত্রতা ও সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, পতিপ্রাণা চন্দ্রাদেবী প্রতিবাসিগণের হৃদয়ে মাতৃরূপে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন।

রঘুবীর-বাৎসল্য এই দরিদ্র ব্রাহ্মণদম্পতির সমগ্র হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। জপ, ধ্যান, পূজা শেষ হইলে ক্ষুদিরাম নিত্য স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া মনোমত করিয়া রঘুবীরকে সাজাইতেন। গায়ত্রী এবং স্তব পাঠ করিতে করিতে দিব্য শ্রীসম্পন্ন এই ব্রাহ্মণের মুখ এক অপূর্ব্ব প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং বুক অজস্র ভক্তিধারায় ভাসিয়া যাইত। উন্নতকায়, তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণ, অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-শ্রীমণ্ডিত, শান্তস্বভাব, প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণকে গ্রামবাসিগণ দেবতাজ্ঞানে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। ক্ষুদিরাম কোথাও উপস্থিত হইলে সেথায় সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইত এবং তিনি আসন গ্রহণ না করিলে তাঁহার সম্মুখে কেহ উপবিষ্ট হইত না। পাছে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূত দেহ কলুষিত হয় এজন্য ক্ষুদিরামের স্নানের সময় অন্য কেহ পুষ্করিণীতে অবগাহন করিত না।

এক পুত্র ও এক কন্যা লইয়া ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবী কামার-পুকুরে আগমন করেন। পুত্র রামকুমারের বয়স তখন দশ বৎসর এবং কন্যা কাত্যায়নীর বয়স চারি বৎসর। দেখিতে দেখিতে

দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। রামকুমার যৌবনারূঢ় হইয়া ক্রমে সংসার-ভার গ্রহণ করিলেন। ক্ষুদিরাম এখন নিশ্চিন্ত। অনন্য-শরণ হইয়া রঘুবীরের সেবা করা ভিন্ন এখন আর তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। কিন্তু এই সময় ৺সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। তিনি পদব্রজে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া সেখানকার যাবতীয় তীর্থ দেখিয়া প্রায় আট নয় মাস পরে কামারপুকুরে পুনরাগমন করেন। প্রত্যাগমনের পর তাঁহার পুত্রসন্তান হয়, ক্ষুদিরাম তাহার নাম রাখিলেন—রামেশ্বর।

রামেশ্বরের যখন আট নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় তাঁহার অগ্রজা কাত্যায়নী দেবী পীড়াগ্রস্ত হ'ন। কিন্তু কন্যার ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা ও আচরণ দর্শনে ক্ষুদিরামের ধারণা হইল যে, উহা পীড়া নহে, প্রেতাবেশ। অতঃপর তিনি স্থির চিত্তে রঘুবীরকে স্মরণ করিয়া দৃঢ়স্বরে প্রেতের উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি যে-ই হও, আমার কন্যাকে ত্যাগ কর।" কথিত আছে, প্রেত সেই সময় ক্ষুদিরামকে তাহার উদ্ধারার্থে গয়ায় পিণ্ডদানে প্রতিশ্রুত করাইয়া কাত্যায়নী দেবীকে পরিত্যাগ করে। সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরাম ৺গয়াধামে গমন করিয়া প্রেতের উদ্ধারার্থে পিণ্ড দিবার পর নিজ পিতৃমাতৃ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। সে সময় তীর্থভ্রমণ যে বহু আয়াস এবং ক্লেশসাধ্য ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতে তখন রেলপথের কল্পনাও হয় নাই এবং এখনকার মত শান্তির শাসনও ছিল না। চোর, দস্যু এবং ব্যাধির হাতে এড়াইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছানই দায়,

তার উপর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা ত মহা সৌভাগ্যের কথা! ক্ষুদিরামের বয়ঃক্রম এখন ষাট বৎসর। তিনি যে এই জীর্ণ বয়সে পথের বিঘ্ন বাধা ক্লেশ সমস্ত অতিক্রম করিয়া তখনকার দিনে দুষ্কর পিতৃকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিত্ত এক অপরিসীম প্রসন্নতা লাভ করিল। ক্ষুদিরাম রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীগদাধরের শ্রীমন্দির অপূর্ব্ব আলোকে এবং দিব্য সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়াছে ও তথায় তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সমবেত হইয়াছেন আর নবীন-নীল-নীরদ-বর্ণ এক দিব্যপুরুষ প্রসন্ন-হাস্যে মন্দিরের দিব্যজ্যোতি মলিন করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন —"ব্রাহ্মণ, তোমার সেবায় আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে আমার সেবাধিকার প্রদান করিব।" বিস্মিত, স্তম্ভিত, পুলকিত ক্ষুদিরাম সহসা জাগিয়া উঠিলেন! তখন তাঁহার শরীর স্বেদাক্ত হইয়াছে এবং এক অপূর্ব্ব উল্লাসে দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! মনে হইল, এখনও যেন সেই দিব্যালোক এবং দিব্য সৌরভে কক্ষ পরিপূর্ণ!

(২)

ভক্তিবিভোর চিত্তে ক্ষুদিরাম গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত স্বপ্ন-কাহিনী কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। ক্ষুদিরাম দেখিলেন, দিনে দিনে চন্দ্রাদেবীর অন্তরে বাহিরে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন প্রকট হইতেছে।

অভ্যন্তরস্থ দীপশিখার প্রভায় কাচ-কলস যেমন জ্যোতির্ম্ময় হয়, চন্দ্রাদেবীর দেহে তেমনি লাবণ্য ঠিকরিয়া পড়িতেছে! তিনি কাছে আসিলে যেন অঙ্গ হইতে দেবমন্দিরের দিব্য সৌরভ বিকীর্ণ হয়? তাঁহাকে দেখিলে দর্শনপিপাসা তৃপ্ত হইতে চাহে না। অতীব উগ্র প্রকৃতি তাঁহার সান্নিধ্যে শান্ত ভাব ধারণ করে। কি এক অপূর্ব্ব করুণায় তাঁহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত; চক্ষু দিয়া যেন অজস্র পীযূষধারা স্রবিত হইতেছে; মমতায় বিগলিত স্বর যেন বিশ্বের বেদনা হরণে নিঃসৃত! তারপর দেবীর স্বভাবে এ কি অপরিসীম উদারতা! এই দরিদ্রা নারী স্নেহ-বাৎসল্যে পল্লীভবন প্লাবিত করিয়া সমস্ত গ্রাম জুড়িয়া যেন অন্নপূর্ণার সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন!

বাহ্যিক লক্ষণসকল লক্ষ্য করিয়া ক্ষুদিরাম বুঝিলেন, পঁয়তাল্লিস বৎসর বয়সে পত্নী দীর্ঘকাল পরে পুনরায় অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন। স্বপ্নদৃষ্ট সেই দিব্যপুরুষকে ক্ষুদিরামের অনুক্ষণ মনে পড়িতে লাগিল।

এদিকে চন্দ্রাদেবীর গুর্ব্বীদশা যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, তিনি ততই বিচিত্র স্বপ্নদর্শনে অভিভূত হইতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে, জাগ্রতেও তাঁহার মনে হইত, যেন অশরীরী পুরুষসকল সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে, এবং যেন কাহার দিব্যমূর্ত্তি সহসা শূন্যে প্রস্ফুটিত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্তরে মিলাইয়া যাইতেছে। কখন মনে হয়, যেন রঘুবীর-গৃহে কত দেবসমাগম হইয়াছে এবং আচম্বিতে কোথা হইতে স্তুতিগান উঠিতেছে! বিস্ময়-পুলকে চন্দ্রাদেবী স্বামীর নিকট সেই সকল অদ্ভূত কাহিনী বর্ণন করেন। গয়ার স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ক্ষুদিরাম তাঁহাকে নানা ভাবে আশ্বাস

দেন। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে দশমাস অতীত হইয়া গেল। ক্রমে প্রসবের দিন উপস্থিত হইল।

ফাল্গুন মাস। নবীন বসন্তসমাগমে প্রবীণ বৃক্ষগণও নব পল্লব ধারণ করিয়াছে। সমস্ত চরাচরে যেন আনন্দস্রোত প্রবাহিত। চারিদিকে হরিতের উৎসব, কুসুমের সৌরভ, ভৃঙ্গের গুঞ্জনরব। মেদিনী পুলকে রোমাঞ্চিত-কলেবরা, যেন কি অধীর আবেগে চঞ্চল তরুপত্রসকল নিরন্তর তরতর করিয়া কাঁপিতেছে! এক দুই করিয়া মাসের পঞ্চম দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। গুর্ব্বিনীর গুরুভাবে চন্দ্রাদেবী এখন নিরতিশয় কাতরা; কিন্তু তথাপি রঘুবীরের সেবা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। গর্ভধারণাবধি দিনে দিনে এই আনন্দবিগ্রহ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিয়াছে এবং যেন সে দুঃসহ বাৎসল্যরস জননীহৃদয় হইতে ক্ষীরধারায় বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। অবশেষে ষষ্ঠ দিবসে চন্দ্রাদেবীর প্রসববেদনা অনুভূত হইল। ক্রমে নিশা অবসান প্রায়। পূর্ব্বগগনে ঊষারাগের সঙ্গে সঙ্গে সুমঙ্গল শঙ্খরোল ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র ভবন কম্পিত করিয়া ভুবনময় দেবশিশুর জন্ম-বারতা প্রচার করিল। উচ্ছ্বলিত আনন্দে বিহগকুল কুজনিয়া উঠিল। শিশুরূপী মহাপুরুষকে দর্শন করিতে অরুণদেব ধীরে ধীরে উদয়াচলে উদিত হইলেন।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি বুধবার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন। বঙ্গে ইংরাজ-অভ্যুদয়ের পর এখনও শতাব্দী পূর্ণ হয় নাই, ইহারই মধ্যে হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। জড়বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এবং উন্নতি পাশ্চাত্য জাতিকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাচীন দেব-দেবীগণকে অধি-



পরমহংসদেবের জন্মস্থান

কারচ্যুত করিয়াছে এবং প্রত্যক্ষবাদ আর্য্যজাতির অধ্যাত্মধর্ম্মকে কুসংস্কারে পরিণত করিয়া শিক্ষিত সমাজের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছে। ক্যাণ্ট্, কম্‌টে, সোপেন্‌হর প্রভৃতি মনীষিগণের নব-প্রবর্ত্তিত চিন্তাধারা সুদূর পাশ্চাত্য ভূমি হইতে প্রবাহিত হইয়া হিন্দুর চিরন্তন সংস্কারসকলকে আলোড়িত করিতে লাগিল। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আঘাতে ইস্‌লামের প্রভাব হইতে যে ধর্ম্ম আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল, প্রবল বলের নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই, নব্য সভ্যতার আলোকে তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। দীর্ঘকাল মুসলমান-সাহচর্য্যে বিলাস-দীক্ষিত হিন্দু শিখিল যে, ভোগ-বিমুখতা আত্মবঞ্চনা মাত্র ; আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি কল্পনা, এবং শাস্ত্রসকল অমূলক জল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য ঐহিক সুখভোগ ও জনসমষ্টির পার্থিব কল্যাণ সাধন। হিন্দুসমাজের সে এক বিষম দুর্দ্দিন। একদিকে তান্ত্রিকতার পাশব যথেচ্ছাচার, অন্য দিকে ভাক্ত বৈষ্ণবদিগের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা। তার উপর চারিদিকে নানা মত, নানা পথ প্রচারিত হইতে লাগিল। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুগণ ভীত চিত্তে দেখিতে লাগিলেন যে, স্বেচ্ছাচারিতা অবাধে আধিপত্য করিতেছে। যাহা ত্যাগ বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা ভোগচরিতার্থতার উপায়রূপে অবধারিত হইয়াছে। কর্ম্ম কুপথগামী, জ্ঞান উদ্‌ভ্রান্ত এবং ভক্তির আসনে ভণ্ড বিরাজমান। ঈশ্বর-লোলুপ চিত্ত চারিদিকে কুহেলিকা দেখিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনে উন্মুখ হইল। শিক্ষিত সমাজে নাস্তিকতা প্রবল হইয়া উঠিল। এমন কি ঈশ্বর-বিশ্বাস যে, অর্ব্বাচীন দুর্ব্বলতা এবং প্রগাঢ় কুসংস্কারের পরিণাম তাহা স্পষ্টরূপে প্রচার

করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সময় মহাত্মা রামমোহন রায় বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনাবিধি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে প্রচার করিলেন। অকূলে কূল পাইয়া অনেকে এই নব ধর্ম্ম অবম্বলন করিতে লাগিল। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাহাতেও উপহাস করিয়া বলিলেন—"হিঁদুঁর তেত্রিশ কোটি দেবতা গিয়া এখন একটায় ঠেকিয়াছে, এটাও গেলে বাঁচি!"

হিন্দুর এমনই এক মহা সঙ্কটের দিবসে, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবল সংঘর্ষে, ভারতের মহারণক্ষেত্রে মহাবাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—'সম্ভবামি যুগে যুগে।' কালের প্রয়োজন কাল আপনি পূর্ণ করে। যখনই জীর্ণ ধর্ম্মে বা শীর্ণ সমাজে সংস্কারের আবশ্যক হয়, ঈশা, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় মহাপুরুষগণ উদিত হইয়া তাহা সাধন করেন। মানবের জাতীয় ইতিহাসে ইহা চিরন্তন সত্য। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদ এই সত্যই সমর্থন করে।

গয়ার স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ক্ষুদিরাম শিশুর নাম রাখিলেন, গদাধর। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ চিরদিন নির্লিপ্তভাবে সংসার করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার কৃতী হইবার পর হইতে ক্ষুদিরামের সংসার-ঔদাসিন্য ক্রমশঃই বর্দ্ধমান হইতেছিল। তিনি কেবল রঘুবীরের পূজার্চ্চনা, সেবা এবং পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া কাল কাটাইতেন। কিন্তু নবজাত শিশু তাঁহাকে নূতন বন্ধন পরাইল। চন্দ্রাদেবীর ত কথাই নাই! ক্ষুদ্র মানবকটির এ কি অদ্ভুত আকর্ষণ! দন্তহীন মুখে একি মনোহর হাসি! আবার বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, অদ্ভুত শিশুর অদ্ভুত আকর্ষণ কেবলমাত্র মাতা-পিতায় নিবদ্ধ নয়, সে যেন সমগ্র গ্রামখানির উপর কি এক মোহমন্ত্রের মায়াজাল

পাতিয়াছে। পল্লীবাসিনীরা গৃহকর্ম্মে অবসর পাইলেই সময়ে অসময়ে ক্ষুদিরামের গৃহে ছুটিয়া আসে, শিশুর দেয়লা-খেলা দেখে, গৃহে ফিরিয়া যাইতে আর পা উঠে না।

এইরূপে পল্লীবাসিগণের হৃদয়ে মধুর বাৎসল্যরস সঞ্চার করিয়া গদাধর ক্রমে পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিল। বালক বড় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাঞ্চল্যেও কি এক অপরূপ মাধুর্য্য আছে যে, প্রাণ ধরিয়া কেহ তাহাকে শাসন করিতে পারেন না। ক্ষুদিরাম দেখিলেন—বালকের অলৌকিক মেধা, অসামান্য ধারণাশক্তি। দেবতার স্তব, পুরাণকাহিনী গদাধর তাঁহার মুখে একবার যাহা শুনে তাহা আর বিস্মৃত হয় না, অবিকল আবৃত্তি করে। তাঁহার অনুমান হইল, বুদ্ধির চাঞ্চল্যহেতু বালকের স্বভাব চঞ্চল, বিদ্যার গুরুভার ব্যতীত তাহা স্থির হইবে না। গদাধর পঞ্চম বর্ষে পড়িতেই ক্ষুদিরাম কালবিলম্ব না করিয়া তাহার হাতেখড়ি দিয়া লাহাবাবুদিগের গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখানে আসিয়া বালক সশিক্ষক সহপাঠীগণকে অপূর্ব্ব প্রীতিবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল।

কেবল মেধা নহে, ক্ষুদিরাম লক্ষ্য করিলেন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালকের চরিত্রে অবালসুলভ কতকগুলি বিশিষ্ট গুণের বিকাশ হইতেছে। গদাধর প্রাণান্তেও মিথ্যা বলে না। মনের ভাব অকপটে, অসঙ্কোচে ব্যক্ত করে এবং ন্যায়-অন্যায়-নির্ব্বিশেষে তাহার সকল অনুষ্ঠানেই এক অকুণ্ঠিত আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। আবার আশ্চার্য্য তাহার অনুকরণ-দক্ষতা। কিন্তু সর্ব্বোপরি বিস্ময়কর তাহার নির্ভীক সাহস, অটল সত্যনিষ্ঠা,

অসামান্য ঔদার্য্য, আন্তরিক প্রীতি-ভালবাসা এবং অমানুষী আকর্ষণশক্তি।

পাঠশালার পাঠ গদাধর সহজেই আয়ত্ত করিতে লাগিল। কিন্তু অসাধারণ শ্রুতিধরত্ব সত্ত্বেও তাহার নামতা মুখস্থ হইত না এবং 'শুভঙ্করী' ধাঁধা লাগিত।

বালকের অলৌকিক আকর্ষণগুণে সমগ্র গ্রাম ক্রমে যেন এক পরিবারে পরিণত হইল। পল্লীর জীবনস্বরূপ গদাইয়ের আদর ঘরে ঘরে। কাহারও বাটীতে নূতন সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে, গদাই না খাইলে তাহার সমস্ত আয়োজন সে পণ্ড বলিয়া মনে করে। প্রিয়দর্শন বালকের আকৃতি এবং প্রকৃতি উভয়ই তাহার অনুপম আকর্ষণশক্তির সহায়। চম্পকের চারুকান্তি, হাসির বিমল জ্যোৎস্না, বিনোদ গঠন, বঙ্কিম নয়ন-দুটীর অব্যর্থ মাধুরী—দেখিলে চক্ষু ফিরে না। তার উপর তাহার মনোহর কণ্ঠস্বর, স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তা ও ভাব-তন্ময়তা কামারপুকুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর দিন দিন যেন কি অব্যক্ত প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। পল্লীতে যাত্রা হইয়া গিয়াছে। বালক গদাধর তাহার অনুকরণ করিয়া অভিনয় করিতেছে। সে অতুলনীয় নৃত্য, সে চিত্তহর ভাবভঙ্গী, সে মাতুয়ারা আত্মহারা সঙ্গীত সমবেত রমণীমণ্ডলীর উপর কি এক রমণীয় ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের নির্ণিমেষ নেত্রে অবিরল জলধারা বহিতেছে—কেহ মুছিতে পারিতেছে না, পাছে সে মনোমুগ্ধকর রসচিত্র ক্ষণিকের জন্য নয়নান্তরিত হয়। পল্লীর স্নিগ্ধ হরিচ্ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্নে যেদিন এই অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্যের

অভিনয় না হইত, বৈচিত্র্য-বিরল পল্লীজীবন সেদিন নিতান্তই নীরস ঠেকিত।

সসীমে অসীমের ইঙ্গিত পাইলে বা কোন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরসে হৃদয় অভিষিক্ত হইলে বালক গদাধরের ভাবপ্রবণ চিত্ত উধাও হইয়া একেবারে অনন্তরাজ্যে চলিয়া যাইত। এইরূপ প্রগাঢ় ভাব-তন্ময়তায় কখন কখন তাহার বাহ্যচৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। সপ্তমবর্ষীয় গদাধর একদিন চারি পাঁচটি বালক সঙ্গে মুড়ি খাইতে খাইতে মাঠে বেড়াইতেছিল। আকাশের একপাশে মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। নিবিড় কালো মেঘ দীঘির জলে, মাঠের কোলে কালি ঢালিয়া ধীরে ধীরে আকাশ ছাইয়া উঠিতেছে। আলোর কোলে কালো ছায়া—এ কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়া! বালকের দৃষ্টি ঘনায়মান প্রান্তর হইতে দূর দিগন্ত অতিক্রম করিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে ধাবিত হইল। সেই সময় সহসা কালো মেঘের কোলে একদল ধবলা বলাকা দেখা দিল—মরি মরি, যেন শ্যামাঙ্গে শ্বেত শতদলমালা দোদুল্যমান! ভাবাবেশে বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। ইহারই অপর নাম ভাবসমাধি। সাধন-ভজন বিহনে যে এরূপ অবস্থা ঘটিতে পারে, বিশেষ বালক বয়সে, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সাধক ক্ষুদিরামও তাহা ধারণা করিতে পারিলেন না। গদাধরের স্বাস্থ্যের জন্য পরিবারস্থ সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইল না, তখন আবার সকলে নিরুদ্বেগ হইলেন।

ইহার দুই এক বৎসর পরে, অর্থাৎ গদাধরের বয়ঃক্রম যখন আট কি নয় বৎসর, সেই সময় আর একবার তাহার এইরূপ

ভাবাবেশ হইয়াছিল। কামারপুকুরের উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম আছে, তথাকার দেবী বিশালাক্ষী দেশ-প্রসিদ্ধ। তাঁহার দর্শনার্থে বহু দূর হইতে লোক সমাগম হইত এবং কামারপুকুরের অধিবাসিনীগণ প্রায়ই তথায় পূজা-মানত প্রভৃতি দিতে যাইতেন। একবার গদাধর ধরিয়া বসিল, রমণীগণের সঙ্গে সে-ও দেবীদর্শনে যাইবে। মধ্যাহ্নের তাপে মাঠের পথ অতিক্রম করিয়া প্রায় এক ক্রোশ যাইতে হইবে, এই নবনীত-কোমল বালকের দ্বারা তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অথচ রঙ্গরসপ্রিয়, সদানন্দ বালক সঙ্গে থাকিলে অন্য সকলের পক্ষে পথ যে সুখাবহ হইবে তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। রমণীগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গদাধর একবার জেদ ধরিলে তাহাকে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। অগত্যা গদাইকে সঙ্গে লইয়া পল্লীবাসিনীগণ হর্ষ-ভয়-আন্দোলিত চিত্তে 'জয় বিশালাক্ষী মায়ী' বলিয়া যাত্রা করিলেন। রৌদ্রতপ্ত আশ্রয়বিরল প্রান্তর হরিৎ মরুর ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। পদতলে আগুন, মাথার উপর অগ্নিকর বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি অটনে আনন্দের অবধি নাই। গদাধরের সুধা-স্বর-সিঞ্চনে তাপের তীব্র প্রতাপও তেজহীন। পল্লীবাসিনীগণ আনন্দ-কোলাহলে মাঠ মুখরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার ঘটিয়া নারীগণের সে অবাধ আনন্দ খণ্ডিত হইল। গানের মাঝখানে গদাধরের উচ্চকণ্ঠ সহসা নীরব হইয়া গেল। শরীর স্পন্দহীন, নয়ন নির্ণিমেষ—কোমল কপোল বহিয়া যেন শ্রাবণের ধারা স্রবিত হইতে লাগিল। বিপন্না রমণীগণের কাতর ক্রন্দন ও

ব্যাকুল আহ্বানে গদাধর কোন সাড়া দিল না। অচেতন বালককে কেহ অঙ্কে লইয়া অঞ্চলে ব্যজন করিতে লাগিলেন; কেহ সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাহার আতপতপ্ত মুখ, চক্ষু ও মস্তক সিক্ত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফলোদয় হইল না। গদাধর তেমনি জড়ের ন্যায় নীরব নিথর হইয়া পড়িয়া রহিল। অবশেষে দলস্থ এক প্রৌঢ়া রমণীর হঠাৎ মনে হইল হয় ত নির্ম্মল চিত্ত, পবিত্র, দেবভক্ত বালকের উপর কোন দেবতা ভর করিয়াছেন। কে জানে, গদাধরের নিষ্পাপ দেহে দেবী বিশালাক্ষীরই বা আবেশ হইয়াছে! তখন সেই বিপন্না রমণীমণ্ডলী সংজ্ঞাহীন বালককে মাঝে রাখিয়া মায়ের মন্দিরাভিমুখিনী হইয়া যুক্তকরে অশ্রুসিক্ত স্বরে ডাকিতে লাগিল—মা রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রসন্ন হও, মুখ তুলে চাও, নিরপরাধ বালকের প্রাণ দান দাও! পল্লীবাসিনীগণ কিছুক্ষণ এই ভাবে দেবীর নাম করিতে করিতে বালকের রমণীয় মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে দিব্য হাস্যচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেহ মৃদুমন্দ স্পন্দিত হইতে লাগিল। গদাধর অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিল। তখন দেবী বিশালাক্ষীর জয়গানে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া বালককে অঙ্কে লইয়া পল্লীবাসিনীগণ দেবীস্থানাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিলেন।

ইতিমধ্যে ক্ষুদিরামের কণিষ্ঠা কন্যা সর্ব্বমঙ্গলার জন্ম হইয়াছে। অস্তাচলগামী তপনের ন্যায় তিনিও ধীরে ধীরে কালের সোপান অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম এখন আটষট্টি বৎসর। ব্রাহ্মণকে দেখিলে মনে হয় যেন সুরসাল সুপরিপক্ক ফল আয়ুবৃন্ত

অবলম্বন করিয়া ঝুলিতেছে—কেবল কাল কর্তৃক আহৃত হইবার অপেক্ষা। সে আহরণেরও অধিক বিলম্ব হইল না।

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ প্রতি বৎসর অতি সমারোহে দুর্গাপূজা করিতেন এবং ক্ষুদিরামও প্রতি বৎসর সে উৎসবে যোগদান করিয়া পূজার কয়দিন পরমানন্দে কাল কাটাইতেন। কিন্তু এ বৎসর, ১২৪৯ সালে, তথায় যাইতে তাঁহার আর পা উঠিতেছে না। মাঝে মাঝে অজীর্ণ রোগের আক্রমণে শরীর জীর্ণ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পরিবারবর্গের যত্ন-সুশ্রূষার আরাম হইতে দূরে অবস্থান তাঁহার সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। আবার তখনই ভাবিলেন, এবার না যাইলে হয় ত মায়ের পূজা দর্শনের শুভ সুযোগ এ জীবনে আর ঘটিবে না। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারকে সঙ্গে লইয়া ক্ষুদিরাম ভাগিনেয়ের গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু পৌঁছিবার পরেই তাঁহার গ্রহণীরোগ পুনরায় দেখা দিল। ক্ষুদিরাম তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। পূজার কয়দিন দিব্য আনন্দে অতিবাহিত হইল। কিন্তু নবমীর দিন রোগ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। ভাগিনেয় উদ্বিগ্ন হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ক্ষুদিরামের ভগ্নী হেমাঙ্গিনী প্রাণপণে ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হায়, সকলই নিষ্ফল হইল! দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনান্তে গৃহে ফিরিয়া রামচাঁদ দেখিলেন, মাতুলের অন্তিমকাল উপস্থিত। ভাগিনেয়ের অশ্রুজড়িত আকুল আহ্বানে মুমূর্ষুর চেতনাসঞ্চার হইল। ক্ষুদিরাম তাঁহাকে বসাইয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। তারপর ভগিনী, ভাগিনেয় ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার অতি সাবধানে তাঁহার শেষ

আদেশ পালন করিলে ক্ষুদিরামের অন্তস্তল হইতে গভীরস্বরে তিনবার রঘুবীরের নাম উচ্চারিত হইল এবং সেই সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণবায়ুও ঊর্দ্ধগমন করিল। বিজয়ার দিন রামচাঁদ তাঁহার দেবোপম মাতুলকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলেন। কামারপুকুরের ক্ষুদ্র কুটীরে বৃহৎ হাহাকার উঠিল।

(৩)

রামকুমার এখন কৃতি সন্তান; পিতার শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাসাধ্য সমারোহে সম্পন্ন করিলেন। ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র কুটীরে জীবন-স্রোত আবার নিত্যনিয়মিত পথে প্রবাহিত হইল এবং তাঁহার তীব্র শোকস্মৃতি ক্রমে সংসার হইতে অপসৃত হইয়া পতিপরায়ণা চন্দ্রাদেবীর হৃদয়ে চিরাশ্রয় লাভ করিল। দুঃসহ বেদনায় তিনি দৃঢ়রূপে শ্রীরঘুবীরকে অবলম্বন করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার এখন প্রবীন; কন্যা কাত্যায়ণী ঘরনী গৃহিণী; কৈশোর অতিক্রম করিয়া রামেশ্বরও স্বাবলম্বন-সমর্থ হইয়াছে; কেবল বালক গদাধর এবং শিশুকন্যা সর্ব্বমঙ্গলা ব্যতীত মাতৃমুখাপেক্ষী আর কেহ নাই। মাতৃহৃদয়া চন্দ্রার এই দুইটি কোমল ভুজপাশ ভিন্ন সংসারে অন্য বন্ধন রহিল না।

এদিকে পিতৃবিয়োগবিধুর গদাধর নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিতা তাহাকে স্নেহের আদরে অভিষিক্ত করিয়া সেই যে স্থানান্তরে গেলেন, কোথায় গেলেন, কৈ আর ত ফিরিলেন না! আনন্দময়ীর আগমনে এ কি নিরানন্দ হইল? রঘুবীর-গৃহে

পূজকের আসন আর একজন অধিকার করিয়াছে! গৃহে স্তব পাঠের সে গুঞ্জনধ্বনি আর নাই—সে চিত্তহর চিরপ্রিয় কণ্ঠস্বর চিরনীরব! সূক্ষ্মদর্শী মেধাবী বালক দেখে, পিতার প্রসঙ্গ শুনিলে মাতার চক্ষু অবিরল অশ্রুতে ভাসিয়া যায়। তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যসকল দেখিলে জননী কেমন উন্মনা হইয়া উদাস নেত্রে চাহিয়া থাকেন। বিশেষতঃ গদাধরকে পিতৃবিরহে বিমর্ষ দেখিলে জননী মনে মনে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। অমানুষী বলে বালক আপনাকে সংযত করিতে শিখিল এবং বেদনাতুর মাতার শোকবিস্মৃতি উৎপাদনের জন্য গদাধরের শত চেষ্টা সহস্রধারে প্রবাহিত হইল। শোকাচ্ছন্ন কুটীর বালকের চপল কলহাসে পুনর্মুখরিত হইতে শুনিয়া চন্দ্রাদেবী কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু সদানন্দ বালক স্ব-ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও লোকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইত, নির্ভীক গদাধর কখন মানিক-রাজার আম্রবনে, কখন ভূতির খালের শ্মশানে একাকী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। চিরপ্রফুল্ল বালকের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাহার অদ্ভুত আচরণ কোনরূপ শঙ্কার কারণ হইল না।

প্রথম জ্ঞানোদয়াবধি পিতৃমুখে পুরাণকাহিনী শুনিতে শুনিতে উত্তরোত্তর ঐ সকল প্রসঙ্গে গদাধরের মনে যে আকর্ষণ, অনুরাগ ও দুর্নিবার পিপাসার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা চরিতার্থ করিতে অলৌকিক-প্রকৃতি বালক এখন হইতে এক অভাবনীয় উপায় অবলম্বন করিল—সাধুসঙ্গ।

কামারপুকুর অঞ্চলের জমীদার লাহাবাবুরা গ্রামের বহির্ভাগে



পূর্ব্বকথিত পূরীর পথের উপর একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাতে সময় সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দর্শন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে এই ধর্ম্মশালায় সমধিক সাধু-সমাগম হইত। তৎকালে কৌতূহলাবিষ্ট দর্শক দেখিত, তথায় এক অপূর্ব্ব আনন্দের মেলা বসিয়াছে! রামনামে মাতুয়ারা হইয়া কোন সাধু ভজন গান করিতেছেন; কোথাও জটাশির সন্ন্যাসীর গম্ভীর-কণ্ঠ-নিঃসৃত 'হর হর বিশ্বেশ্বর' রব, সে ক্ষুদ্র পান্থ-বাসকে বরেণ্য বারাণসী-মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে; আবার কোনখানে বা প্রমত্ত হরিসঙ্কীর্ত্তনে তদ্‌গতচিত্ত শ্রোতার নয়নে প্রেম-যমুনা প্রবাহিত হইতেছে; কেহ মধুরছন্দে ভাগবত পাঠে নিবিষ্ট, কাহারও কলকণ্ঠে তুলসীদাসের রামায়ণ-গাথা মধুর ধারায় অজস্র বিগলিত; হেথা বিচিত্র নৃত্যসহকারে বাউলের গানে আনন্দের ফোয়ারা ছুটিতেছে, হোথা প্রসাদ-পদাবলীর সুললিত লহরী উঠিতেছে! মধুচক্রের এই মধুগুঞ্জন সহ আরতি ও ভোগনিবেদনের শঙ্খঘণ্টারোল মিলিত হইয়া সেই গ্রাম্য পান্থ-শালা রথযাত্রার সময় কিছু দিনের জন্য পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হইত। সে সময় পুণ্যশ্লোক বালক গদাধর দিবসের অধিকাংশ-ভাগই সাধুসঙ্গে অতিবাহিত করিত এবং কখন কখন তাঁহা-দিগের রন্ধনের কাষ্ঠ, পানীয় জল প্রভৃতি সযত্নে আহরণ করিয়া দিত। নির্ম্মলচিত্ত, মধুরস্বভাব বালকের অযাচিত সেবায় সাধুগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া অকৃত্রিম স্নেহে তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতেন এবং কখন কখন তাহার সহিত একত্র বসিয়া

প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। সাধুগণের আশীর্ব্বাদে পুত্রের ভাবী মঙ্গল কল্পনা করিয়া গদাধরের সাধুসহবাস চন্দ্রাদেবী এতদিন প্রসন্ন চক্ষেই দেখিতেছিলেন। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ সে নিশ্চিন্তভাব বিদূরিত হইয়া উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁহার মাতৃহৃদয় সজাগ হইয়া উঠিল। ঐ দিন গদাধর এক অভিনব বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মা, সন্ন্যাসীঠাকুর আমাকে কেমন সাজিয়ে দিয়েছেন দেখ।' বালকের বিভূতিভূষিত কলেবর, তাহার চাঁচর চিকুর-পরিবৃত ললাটভাগে শিশু শশধরসদৃশ সমুজ্জ্বল তিলকরাগ, তাহার নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া বহির্ব্বাস ও কৌপিণ ধারণ এবং সর্ব্বোপরি তাহার দিব্যভাবাপন্ন পবিত্র মুখশ্রী অনিমেষ মুগ্ধনেত্রে দেখিতে দেখিতে অবিরল জলধারে মাতার বক্ষস্থল সিক্ত হইতে লাগিল। তিনি নীরবে পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং সে স্নেহকোমল বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়া বালক বুঝিল যে, সংসারে কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া সে শোকার্ত্ত হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। মেধাবী বালকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পাছে সন্ন্যাসীগণ তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, এই আশঙ্কায় মাতা অন্তরে অন্তরে বিচলিত হইয়াছেন। গদাধর প্রতিশ্রুত হইল যে, মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সে কখন কোথাও যাইবে না। কিন্তু চন্দ্রাদেবী বালকের কথায় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। মাতাকে বিশেষরূপে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত গদাধর সাধুসঙ্গ-বাসনা পরিত্যাগ করিল। এদিকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীগণের কঠোর হৃদয়ও প্রিয়দর্শন বালকের অদর্শনে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা চন্দ্রাদেবীর

নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বালককে মাতার স্নেহনীড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইবার বাসনা দিনেকের তরেও তাঁহাদের অন্তরে উদিত হয় নাই। সাধুদিগের কথায় চন্দ্রাদেবী আশ্বস্ত হইলেন। গদাধরের অভীষ্ট-সাধনায় আর কোন অন্তরায় রহিল না।

ক্রমে গদাধরের উপনয়ন-কাল সন্নিকট হইল। অগ্রজ রামকুমার অসীম উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত অনুজ সে প্রোজ্জ্বল উৎসাহ-শিখায় সহসা শীতল বারি নিক্ষেপ করিল। অনুষ্ঠানের অনতিপূর্ব্বে গদাধর জ্যেষ্ঠের নিকট অম্লানমুখে আবদার করিল যে, তাহার সূতিকাগৃহের ধাত্রী ধনীকামারিণী তাহাকে সর্ব্বপ্রথম ভিক্ষা প্রদান করিবে; ধনী ইতিপূর্ব্বে তাহার ভিক্ষামাতা হইবার জন্য তাহাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়াছে, এবং তাহার কামনা পূর্ণ না হইলে গদাধরের সত্যভঙ্গ হইবে। অকস্মাৎ অনুজের এই অদ্ভুত প্রার্থনায় অগ্রজ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি গদাধরকে বিশেষরূপেই চিনিতেন; জানিতেন, বালক হইলেও তাহার প্রতিজ্ঞা অটল। সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন পণ্ড হইলেও তাঁহার সৃষ্টিছাড়া ভাইটি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে অপরাধী হইবে না এবং এ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার অনুনয়-বিনয়, শাসনও সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কিন্তু রামকুমারও সহসা কুলপ্রথার অবমাননা করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি বালককে কাছে বসাইয়া বিস্তর তর্ক প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু গদাধরের মুখে সেই এক কথা—যে সত্যভঙ্গ করে, সে ব্রাহ্মণের অধিকার গ্রহণ বা পবিত্র যজ্ঞসূত্র

ধারণের যোগ্য নহে। যে বালক অদূর ভবিষ্যতে লাহাবাবুদিগের শ্রাদ্ধসভায় শাস্ত্রীয় জটিল প্রশ্নবিশেষের অপূর্ব্ব মীমাংসা করিয়া বঙ্গের সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, সে সহজে পরাস্ত হইবার পাত্র নয়, আর তর্কে পরাভূত হইলেও সে যে সত্যবিচ্যুত হইবে, সে সম্ভাবনা আকাশকুসুম হইতেও অলীক। সঙ্কটে পড়িয়া রামকুমার তাঁহার পিতৃসুহৃদ্ ধর্ম্মদাস লাহার শরণাপন্ন হইলেন। ধর্ম্মদাস তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, গদাধরের আবদার তাঁহাদের বংশরীতি বহির্ভূত হইলেও, এরূপ আচরণ বিরল নহে, অনেক সদ্ব্রাহ্মণের গৃহেও দেখা যায়। অবশেষে গদাধরেরই জয় হইল। 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া উদার-হৃদয় বালক ভাগ্যবতী ধনীর নিকট প্রথম অঞ্জলি পাতিল।

(৪)

কুসুমে সৌরভ উচ্ছ্বাসের ন্যায় ঠিক কোন্ সময় যে শ্রীরাম-কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বময়ী ঐশী প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে, উপনয়নান্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার স্বভাবতঃ ভক্তিপরায়ণ এবং ধ্যানপ্রবণ মন নিত্য-নিয়মিত সন্ধ্যা-বন্দনাদির পর একনিষ্ঠভাবে শ্রীরঘুবীরের পূজার্চ্চনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তেজঃপুঞ্জ এই ব্রাহ্মণ-বটুর প্রগাঢ় ভক্তি, একাগ্র ধ্যান-ধারণা, অশ্রুপূত স্তব-বন্দনা এবং একান্ত দীনহীন ভাবে আত্মনিবেদন সকলের মনে যুগপৎ যেমন

বিস্ময় তেমনি সম্ভ্রমের উদয় করিত। উপযাচক ভাবে আসিয়া যিনি এই নিঃস্ব পরিবারে অজস্র কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন, যে শ্রীবিগ্রহের সহিত পিতার সহস্র স্মৃতি বিজড়িত, সেই প্রত্যক্ষ দেবতাকে স্পর্শ এবং পূজা করিবার অধিকার পাইয়া দেবভক্ত বালক যে নিরতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র কি?

গদাধরের বাল্যজীবনে পূর্ব্বে দুইবার আমরা সমাধি-সমাগমের কথা উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরঘুবীরচরণে অহেতুকী ভক্তির ফলে, ভাবের তন্ময়তায় এবং ধ্যানের একতানতায়, আগন্তুকের ন্যায় সেই সমাধির আকস্মিক আগমন ক্রমে প্রেমাস্পদের ঈপ্সিত অভিসারে পরিণত হইয়া প্রেমিক বালকের দিব্যচক্ষুর সমক্ষে এক অলৌকিক আনন্দময় ভাবরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। ফাল্গুন মাস। শিবরাত্রির পুণ্যব্রতানুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষবিরহিত ক্ষুদ্র কামারপুকুর গ্রাম 'হর হর' রবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ ব্রতে উপবাস এবং অনিদ্রায় শিবার্চ্চনা বিধি। এ জন্য পল্লীবাসিগণের নিশাজাগরণের অবলম্বনস্বরূপ পাইন্‌বাবুদিগের বাটীতে শিববিষয়ক যাত্রার আয়োজন চলিতেছে। বালক গদাধর সারাদিন নিরম্বু উপবাসের পর সবেমাত্র রাত্রির প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া মহাদেব-মহিমায় মগ্ন হইয়া বসিয়া আছে। সেই সময় তাহার কয়েকজন বয়স্য আসিয়া সমাচার দিল যে, যাত্রায় যাহার শিব সাজিবার কথা ছিল, সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইতে বসিয়াছে। এখন অভিনয়নিপুণ গদাধর উক্ত ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যাত্রার সূচনা করিয়া না দিলে নিরুপায়। গ্রামের সমগ্র

লোকের আশা, উৎসাহ, উদ্যোগ, ব্রতানুষ্ঠান, সবই বিফল হইয়া যায়! এই অভাবনীয় অনুরোধে গদাধর বিস্মিত হইল। জপ, ধ্যান ও শিবপূজার্চ্চনায় সারারাত্রি অতিবাহিত করিবার যে বিশাল কল্পনা তাহার ভক্তিপ্রবণ চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, বয়স্যগণ সে সম্বন্ধে কোন কথাই শুনিল না। অবশেষে নানা বাদানুবাদের পর সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গদাধর তাহাদের অনুগমন করিল।

পাইন্‌বাবুদিগের বাটীর প্রাঙ্গণে যাত্রার আসরে তখন বিপুল জনতা, তুমুল গোলমাল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে যেন যাদুদণ্ড-স্পর্শে সহসা সে জনকল্লোল স্তব্ধ হইয়া গেল। সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিল যেন সাক্ষাৎ বাল-গঙ্গাধর প্রসন্ন স্মিত হাস্যে দিক আলোকিত করিয়া গজেন্দ্রলাঞ্ছিত গমনে ধীরে ধীরে আগুয়ান! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বিভূতিভূষিত সে তরুণ তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, তাহার আপাদবিলম্বিত জটাভার, সে ধ্যানস্তিমিত নেত্র এবং মৃদুহাস্যস্ফুরিত অধরমাধুরি নিস্পন্দ নেত্রে দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাক্ জনমণ্ডলী পুলকিত রোমাঞ্চিত কলেবরে অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খরোল ও নারীকণ্ঠ-নিঃসৃত উলুধ্বনিতে সে যাত্রার আসর নিমেষে দেববাসরে পরিণত হইয়া গেল! কিন্তু যাহার চারিপাশে এই উত্তাল ভাবসমুদ্র আনন্দ-উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে, সে স্বয়ং সংজ্ঞাহীন—অঙ্গ অসাড়, সম্পূর্ণ প্রাণ-চেতনা-বিরহিত—কেবল দুই নয়নপ্রান্ত দিয়া অবিরল জলধারা ব্যতীত জীবিতের আর কোন লক্ষণ নাই! শঙ্কিত সহচরগণ বালকের নিথর নিস্পন্দ



দেহ সন্তর্পণে বহন করিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিল। জনশ্রুতি এইরূপ যে, গদাধরের এই ভাবসমাধি কয়দিন পর্য্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই।

অগ্রজ রামকুমার কনিষ্ঠের এই অলৌকিক অবস্থাকে বায়ু-রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং যাহাতে বালকের স্বেচ্ছাধীন কার্য্যে কেহ কোনরূপ বাধা প্রদান না করে তৎসম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন, কেন না, মানসিক উত্তেজনায় পীড়া বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। গদাধরের পাঠশালে গমনাগমনও এখন হইতে স্বেচ্ছাধীন হইল।

এ সময় গদাধরের শিক্ষা যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুরূহ। তবে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থসকল পাঠ বা আবৃত্তি করিতে তাহার দ্বিতীয় কেহ ছিল না। এখনকার মত তখন মুদ্রিত পুস্তকের বহুল প্রচার হয় নাই। চারণগণ কর্ত্তৃক রাজপুতকাহিনী যেমন গীত হইত, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে বৈষ্ণব ভিখারিগণ সেইরূপ ভক্তি-উপাখ্যানসকল গান করিয়া বেড়াইতেন। অসাধারণ শ্রুতিধরত্ব-গুণে বালক একবার যাহা শুনিত, তাহা অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিত। অবকাশবহুল বৃদ্ধগণ এবং গৃহকর্ম্মের অবসরে পল্লীরমণীগণ সুধাকণ্ঠ বালকের মুখে ঐ সকল প্রেমভক্তি-কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুনিয়া ক্ষণিকের জন্য কর্ম্মকোলাহল-ময় সংসারের দুঃখ দৈন্য, জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিতেন। এই নির্দ্দোষ আমোদের জন্য নিরীহ পল্লীবাসিগণের অশেষ আগ্রহ বালক পুলকিত চিত্তে পরিপূর্ণ করিত। ভক্তি-কাহিনী ও উপাখ্যান সংগ্রহ করিতে গদাধরের অসামান্য যত্ন ছিল। গ্রাম্য

কবি-রচিত পুঁথি পাইলে সে স্বহস্তে তাহা নকল করিয়া রাখিত।

অর্থকরী বিদ্যার উপর ধর্ম্মপ্রাণ কনিষ্ঠের অনাস্থা এবং সুশিক্ষিত হইয়াও মধ্যম সহোদর রামেশ্বরের উপার্জ্জনে ঔদাস্য লক্ষ্য করিয়া রামকুমার মনে মনে ভীত হইয়া উঠিলেন। সংসারে লোকবৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয়বৃদ্ধি নাই। তাহার উপর সম্প্রতি বহু অর্থের প্রয়োজন, কেন না, রামেশ্বর ও কনিষ্ঠা ভগিনী সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ দিতে হইবে। রামকুমার স্থির করিলেন যে, পরিবর্ত্ত-বিবাহ হইলে আপাততঃ পণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। দৈবকৃপায় সেরূপ সম্বন্ধও দুষ্প্রাপ্য হইল না। কামারপুকুরের নিকটস্থ গৌরহাটী গ্রামের রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সর্ব্বমঙ্গলার বিবাহ দিয়া রামকুমার রামসদয়ের ভগিনীর সহিত রামেশ্বরের বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন।

এই সময় অপর এক দারুণ দুশ্চিন্তা রামকুমারকে পীড়া দিতে লাগিল; এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে পত্নীর অন্তর্ব্বত্নী লক্ষণসকল দেখিয়া রামকুমার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কি উপায়ে বলা যায় না, কিন্তু রামকুমার জানিতেন যে, গুর্ব্বিনী হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিনীর জীবনসংশয়। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিল। যথাসময়ে পরম রূপবান সন্তান প্রসব করিয়াই প্রসূতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ঘরণী বধূর মৃত্যুতে সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্যের সহিত রামকুমারের শিশুপুত্রের পালনভারও চন্দ্রাদেবীর উপর পড়িল। একে অসচ্ছল সংসার, তাহার উপর দুগ্ধপোষ্য মাতৃহীন শিশু, পত্নী-

বিয়োগবিধুর রামকুমার যেমন দুশ্চিন্তা তেমনি দিন দিন ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেশে থাকিতে দুর্দ্দশার কোনই প্রতিকার হইবে না বুঝিয়া ব্রাহ্মণ অবশেষে স্থির করিলেন, কলিকাতায় থাকিয়া উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিবেন। মধ্যম সহোদর রামেশ্বরের উপর সংসারের ভার দিয়া রামকুমার একদা রাজধানী কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

রামেশ্বর সংসারের অভিভাবক হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদাসী হৃদয় সংসারিক কর্ত্তব্য-সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইতে পারিল না। সাধুসঙ্গপ্রিয় যুবক দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। 'যা করেন রঘুবীর' বলিয়া তিনি স্রোতের মুখে তরণী ভাসাইয়া দিলেন।

গৃহকর্ম্মনিপুণ গদাধর এখন চন্দ্রাদেবীর প্রধান অবলম্বন। পাঠশালার বিদ্যাভ্যাসে যে শিথিলপ্রযত্ন, 'শুভঙ্করী'র সরল হিসাবে যাহার ধাঁধা লাগিয়া যাইত, রঘুবীরের সেবা ও প্রসাধনে, অগ্রজের শিশুপুত্রের রক্ষণে এবং সংসারের নানাবিধ কার্য্য-করণে তাহার নারীসুলভ নৈপুণ্য দেখিয়া চন্দ্রাদেবীর গৃহাগতা প্রতিবেশিনীগণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতেন। সহৃদয় এই সকল পল্লীরমণী চন্দ্রাদেবীকে নিতান্ত নিরুপায় ও অসহায় জানিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার কুটীরে আসিয়া কর্ম্মসঙ্গিনী হইতেন। জননীর হিতৈষিণী এই রমণীগণের চিত্তরঞ্জন করিতে গদাধর সাধ্যানুসারে ত্রুটী করিত না। তাহার ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত। কোন দিন পুরাণ পাঠ, কোন দিন পাঁচালীর ছড়া, কখন ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির কাহিনী আবৃত্তি, কখন সঙ্কীর্ত্তন, আবার কোন সময় বা যাত্রার সঙের পালা হুবহু অভিনয়

করিয়া, অসাধারণ অনুকরণ-দক্ষ বালক আসন্ন সন্ধ্যার সে স্তব্ধ বাসর কখন করুণ অশ্রু-প্লাবিত, কখন কলহাস্য-মুখরিত করিয়া তুলিত। দিনে দিনে গদাধর এই স্নেহপরায়ণা প্রতিবেশিনীগণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর হইয়া উঠিল। নিজ নিজ গৃহকার্য্যসকল যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিয়া পল্লীবাসিনীগণ গদাইকে দেখিবার নিমিত্ত নিত্য সমুৎসুক চিত্তে চন্দ্রাদেবীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। অবসর পাইলে স্নেহমুগ্ধ বালকও তাঁহাদের গৃহে গমন করিত।

কিন্তু গদাধরের সহিত রমণীমণ্ডলীর এইরূপ সরল, অসঙ্কোচ, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এবং বালক গদাইয়ের স্বেচ্ছামত সকলের অন্তঃপুরে গমন সম্বন্ধে দুর্গাদাস পাইন নামক এক ব্যক্তি বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোর অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী। পাছে তাঁহার অন্তঃপুরীকাগণ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভিতরের কোন কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি নিজে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন ও সুযোগ পাইলেই সকলকে আত্মানুরূপ উপদেশ দিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ বালক গদাধরের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অভাব ছিল না। কিন্তু অন্তঃপুর—অন্তঃপুর।

গদাধর একদিন তাঁহার উক্তরূপ মন্তব্য শুনিয়া নির্ভীকভাবে উত্তর দিল, 'অন্দরমহলে বন্ধ করে রেখে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা যায় না। সুশিক্ষা, দেবভক্তি ও ধর্ম্মবলই চরিত্র রক্ষার উপায়। আমি ইচ্ছা করলে তোমার পরিবারের স্ত্রীলোকদের দেখ্‌তেও পারি, আর অন্দরের সব কথা জান্‌তেও পারি।' সতর্ক দুর্গাদাস সদর্পে

উত্তর দিলেন, 'কৈ, কেমন পার, জান দেখি!' 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে', বলিয়া গদাধর চলিয়া গেল।

ইহার কিছু দিন পরে একদিন অপরাহ্নে দুর্গাদাস অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন। সেই সময় ময়লা সাটী এবং সামান্য রূপার গহনা-পরা চুব্‌ড়ি হাতে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে অবগুণ্ঠণান্তরাল হইতে কহিল, 'আমি তাঁতিদের মেয়ে, হাটে সুতো বেচ্‌তে এসেছিনু। আমার সেথোরা সব আমাকে ছেড়ে চলে গেছেক। আজকের রাতটুক যদি ঠাঁই দেন।'

পাইন্‌মহাশয় স্ত্রীলোকটীর বাসস্থান প্রভৃতির বিষয় দু'একটা প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অন্দরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে এই নবাগতাকে পাইয়া তাহার মিষ্ট কথায় আশ্রয়-ভিক্ষায় পাইনের আত্মীয়াগণ করুণায় বিগলিত হইলেন। আহা, এই কচি বয়স, পথহারা, আর এমন রূপ! ইহাকে কি সারা রাত মাঠে ফিরিতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়! পথে-ঘাটে কত দুষ্ট লোক আছে! সামান্য রূপার গহনা হইলে কি হয়! কেহ হয় ত ভুলাইয়া লইবে! থাক মা, তুমি স্বচ্ছন্দে এইখানে থাক। তন্তুবায়-রমণী কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহাদের প্রদত্ত জলপান গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই ঘনায়মান সান্ধ্য অন্ধকারে কেহ দেখিতে পাইল না যে, এই বিপন্না রমণীর তীক্ষ্ণ চক্ষুদুইটী প্রখর দৃষ্টিতে তাহাদের সকল গতিবিধি, আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের হাস্য পরিহাস, কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে তাহার ঝাঁপির জলপান হাত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে! গৃহকর্ম্মনিরতা রমণীগণ

সন্ধ্যার অবকাশে এই ম্রিয়মানা বিপন্না নারীকে হৃষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার সন্নিকটে আসিয়া বসিলেন। দুর্গাদাসের অন্তঃপুর-দ্বারে বড় কড়া পাহারা, খুব মজবুত চাবিতালা। সহসা তথায় কাহারও প্রবেশাধিকার নিষেধ! আজ এই নবীনা বিদেশিনীকে দৈবকৃপায় কাছে পাইয়াই অন্তঃপুরচারিণীগণ স্ত্রীসুলভ চাপল্য ও বাচালতায় তাহার নিকট সকলে প্রাণের কপাট উন্মুক্ত করিল, এবং কথায় কথায় নানা আলোচনায় প্রহরেক রাত্রি অতীত হইয়া গেল।

এদিকে নিরতিশয় সুভ্রাতৃবৎসল রামেশ্বর গৃহে সহোদরের সুদীর্ঘ অনুপস্থিতিতে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পল্লীর ঘরে ঘরে তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে দুর্গাদাসবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া 'গদাই' বলিয়া ডাকিতেই অন্তঃপুর হইতে সুস্পষ্ট উত্তর আসিল—"দাদা, যাচ্ছি গো," এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্তুবায়-রমণী ত্বরিৎপদে বাহিরে আসিয়া রামেশ্বরের হস্ত ধারণ করিল। অন্তঃপুরে মুগ্ধ বিস্ময়ের প্রবাহ ছুটিল। বাহিরে দুর্গাদাসবাবু বালকের প্রসাধন ও অভিনয়-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবেন, কি তাহার স্পর্দ্ধায় রুষ্ট হইবেন, তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহার সকল দ্বিধা নির্ম্মল রহস্য-হাস্য-ধারায় গড়াইয়া পড়িল। গদাইয়ের উপর মনে মনে অধিকক্ষণ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে, কামারপুকুর বা তৎসন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে এমন কেহ ছিল না।

গদাধরের এইরূপ অনন্যসাধারণ অভিনয়-দক্ষতায় তাহার প্রিয় সহচরগণ একটী যাত্রার দল গঠন করিবার অভিলাষ করিল।

গদাই তাহাতে সহজেই সম্মত হইল, কেন না, এই সুযোগে তাহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বয়স্যবর্গের সহিত নিত্য দেখা সাক্ষাৎ হইবে এবং সেজন্য অনিচ্ছাসহকারে আর পাঠশালায় যাইতে হইবে না। প্রাগুক্ত মানিকরাজার আম্রবন মহলা দিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতির এই সুসজ্জিত আসরে গদাধরপ্রমুখ বালকগণ নিত্য সমবেত হইত। তলে—তৃণদলে সবুজ বিছানা পাতা। উপরে ঘন পল্লব-রচিত নীল চন্দ্রাতপ। অভিনয় চলিতেছে। গদাধরের সুললিত তান-তরঙ্গে বিহঙ্গ স্তব্ধ; ক্ষেত্রে কৃষক হলচালনা ভুলিয়াছে; দূর প্রান্তরে উত্থিতপদ পথিক নিশ্চলভাবে উৎকর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছে। নিত্য এইরূপ মহলা চলে।

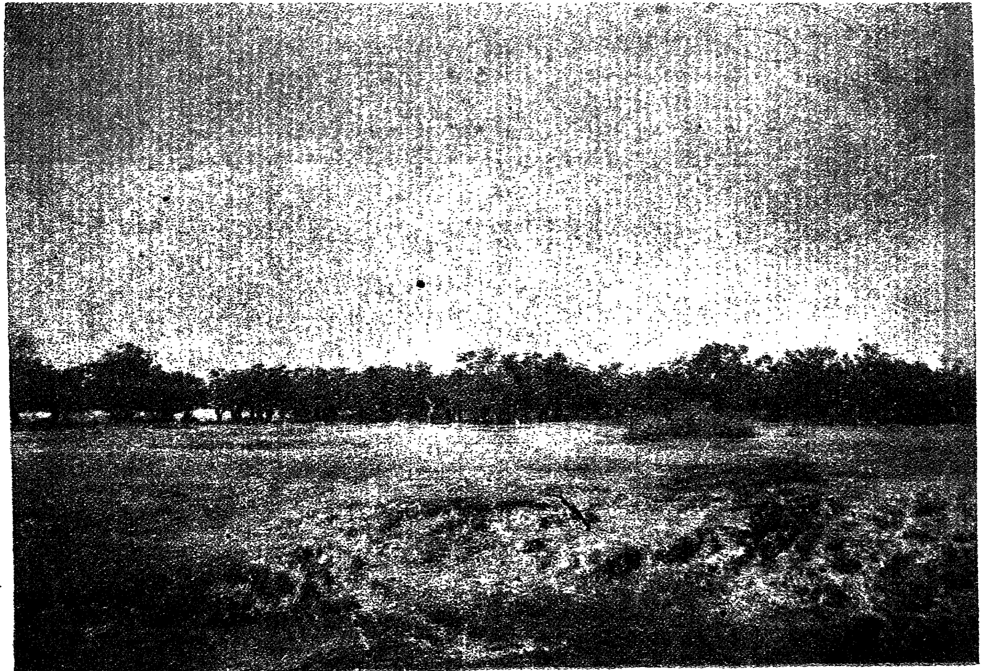
এই নির্দ্দোষ যাত্রার আমোদ ব্যতীত গদাধর কখন কখন দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠন করিয়া বয়স্যগণের সহিত যথাবিধি পূজা করিত। গদাধরের গঠিত মূর্ত্তিসকল এমন ভাবময় হইত যে, প্রবীণ শিল্পীগণও তাহার অশিক্ষিত পটুত্বের অপর্য্যাপ্ত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বালকের ধ্যানকল্পিত গঠন-মাধুরি ও অবয়ব-ভঙ্গিমা দেখিলে মনে হইত, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ব্যতীত কল্পনায় এরূপ সৌন্দর্য্যের উদ্ভব অসম্ভব। চিত্রবিদ্যায়ও গদাধরের অনুরূপ নৈপুণ্য ছিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। প্রায় তিন বৎসর হইল, অগ্রজ রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে টোল খুলিয়াছেন এবং ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার আর্থিক অবস্থারও কথঞ্চিত্ উন্নতি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তিনি দেশে আসিতেন এবং কনিষ্ঠকে

অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জনে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে নিশ্চিন্ত মনে কালাতিপাত করিতে দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইতেন। অবশেষে চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া রামকুমার স্থির করিলেন, গদাধরকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন। টোলের ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্মও বর্দ্ধিত হইয়াছে, প্রৌঢ় বয়সে একক আর তিনি সকল কার্য্য সমাধা করিয়া উঠিতে পারেন না, একজন সাহায্যকারীর অত্যাবশ্যক। গৃহকার্য্যনিপুণ গদাধরই ঠিক তাঁহার উপযুক্ত সহায়। স্থির হইল, গদাধর গৃহকর্ম্মে অগ্রজকে সহায়তা এবং টোলে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবে। পিতৃপ্রতিম অগ্রজকে সাহায্য করিবার সম্ভাবনায় গদাধর হৃষ্টমনে এই পরামর্শে সম্মতি প্রদান করিল। অতঃপর শুভদিনে বয়স্যবর্গের নিকট বিদায় এবং জননী ও মধ্যমাগ্রজের পদধূলি লইয়া পল্লীভবন আঁধার করিয়া গদাধর অগ্রজের সহিত কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(৫)

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীযুক্ত রামকুমার ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটীর সন্নিকটে টোল খুলিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পল্লীর কয়েকটী ভদ্র-ঘরে যজনকার্য্যও করিতেন। সম্ভবত তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশ বৎসর। একে বয়স হইয়াছে, তার উপর সংসারের শোক, তাপ, দুঃখ, দৈন্যে হৃদয় ভারাক্রান্ত, সকল কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে তাঁহার দেহের উপর অতিশয় অত্যাচার ...শ্রীমান্ গদাধর কলিকাতায় আসিতে তাঁহার শ্রমভার



কামার পুকুরের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মানিক রাজার প্রতিষ্ঠিত আম্রকানন।

অনেকটা লাঘব হইল। দেবভক্ত অনুজ যজনকার্য্যের ভার নিজ মস্তকে তুলিয়া লইলে রামকুমার একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, কনিষ্ঠের উন্নতিকাম জ্যেষ্ঠ দেখিলেন, উদাসী সহোদরের জীবনতরী এখনও তরঙ্গে ভাসমান— যদৃচ্ছা চালিত, বাঞ্ছিত বন্দর-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে না। জননীর বৈধব্যবিধুর বার্দ্ধক্যের একমাত্র সহায়, সান্ত্বনা, অবলম্বন, তাঁহার একান্ত আদরের ধনকে যে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছেন, সে কি কেবল যজনকার্য্যে জ্যেষ্ঠের প্রতিভূ হইবার জন্য, না, তাহাকে অর্থকরী বিদ্যানুশীলনে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিবার নিমিত্ত? নিজের শোকসন্তপ্ত, অবিশ্রান্ত সংসার-রণক্লান্ত জীবন কবে আছে, কখন নাই; মধ্যম রামেশ্বর নিতান্ত অপরিণামদর্শী; সংসারের ভরসা মাত্র গদাধর। কনিষ্ঠের পাঠে অমনোযোগীতা দর্শনে রামকুমার যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। একদিন একটু অনুযোগও করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ যে উত্তর দিল, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।—'ও চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যায় আমার দরকার নেই!' কিছুক্ষণ কথাবাত্রার পর রামকুমার বুঝিলেন যে, যে বিদ্যায় অবিদ্যা নির্ম্মূল হয়, অনুজের একান্ত লক্ষ্য তাহাই। শিশুমুখে সহসা প্রবীনবাক্য শুনিলে যাহা হয়, রামকুমারের তাহাই হইল। তিনি স্থির করিতে পারিলেন না যে, বালকের এই বার্দ্ধক্যোচিত সিদ্ধান্ত নিরতিশয় ধর্ম্মানুরাগের সাময়িক উচ্ছ্বাস অথবা দৃঢ়মূল বৈরাগ্যের পরিণাম? যাহাই হউক, ভবিষ্যতে এ বিষয় পুনরুত্থাপন করিবার শুভ অবসরের প্রতীক্ষায়, তিনি নিত্য-নিয়মিতরূপে ভগ্নমনে সংসারের ভগ্নতরী

বাহিতে লাগিলেন এবং গদাধরও আপাততঃ নিশ্চিন্ত মনে দেবসেবা করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন যাইতে না যাইতে অগ্রজ লক্ষ্য করিলেন যে, কামারপুকুরের ন্যায় কলিকাতার এই সুশিক্ষিত গৃহস্থপল্লীতেও তাঁহার অদ্ভুত সহোদরের অপ্রতিহত আকর্ষণ-প্রভাব সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার যজমান পরিবারের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই অলৌকিক বালকের দেবভক্তি, অর্চ্চনানুরাগ, সরল, সহৃদয় ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাহার সুধাময় সঙ্গীতে মুগ্ধ ; যেন কতকাল হইতে সে এই সকল গৃহস্থ-পরিবারের প্রিয়-পরিজন মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

এদিকে প্রতিকূল নিয়তির সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়া রামকুমার যখন তাঁহার সাংসারিক উন্নতি ও ভ্রাতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইতেছিলেন, অনুকূল দৈব তখন উভয়ের ভাবী জীবনক্ষেত্র যেরূপে প্রস্তুত করিতেছিলেন, পাঠককে আমরা এখন সেই কথাই বলিব। কলিকাতার দক্ষিণবিভাগে জানবাজার-পল্লী-নিবাসিনী যশস্বিনী রাণী রাসমণির নাম এই দৈব সূচনার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট।

যে সময়ের ঘটনাবলি বিবৃত হইতেছে, তাহার বহুদিন পূর্ব্বে পুত্রহীনা রাণী বিধবা হইয়া পতির বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, দেবভক্তি, উদারতা, তেজস্বিতা, মনস্বিতা এবং সৎকীর্ত্তির জন্য মাহিশ্যকুলোদ্ভবা এই দেবোপমা রমণীর নাম জন-রসনায় শ্রদ্ধা ও গৌরবের আসন পাতিয়াছিল।

চারি কন্যা লইয়া চুয়াল্লিস বর্ষ বয়সে রাণী বিধবা হইয়াছিলেন। এখন তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে। যাহাদের জন্য পতি-

পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন, তাহারা ধীরে ধীরে তাঁহার চারিদিকে বাড়িয়া উঠিতেছে। তবে আর কেন? বহুদিন ত বিষয়সেবা হইয়াছে। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, এই বিলাস-ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্য একদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। পতি অগ্রগামী হইয়াছেন। একটী কন্যাও পিতার অনুগামী হইয়াছে। তাঁহারই বা আর বিলম্ব কত? আর কত দিন, কত দূর? মনস্বিনী রাণী দেখিলেন, তাঁহার অক্লান্ত শ্রম যত্নে পার্থিব বিষয়ের আয় আশাতীতরূপ বাড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজের কিছুই সঞ্চয় হয় নাই। যাত্রার সময় সন্নিকট, তাঁহার অশক্ত দেহ, হীনবল ইন্দ্রিয়দল, মাথার কেশ পর্য্যন্ত এই কথা বলিতেছে। কিন্তু এক কপর্দ্দকও তাঁহার হাতে পাথেয় সম্বল নাই। লোকে তাঁহাকে ভরসা দেয়, তিনি এত দান-ধ্যান করিয়াছেন, তাঁহার ভাবনা কিসের? স্বর্গ ত তাঁহার ইন্‌সিওর করা! কিন্তু বিচক্ষণ বুদ্ধিমতি রাণী বুঝেন, তিনি দান করিয়াছেন, দাদন দেন নাই। যাহাই হউক, রাসমণি স্থির করিলেন, এখন হইতে অনিত্য বিষয়ের ভাবনা আরও কমাইয়া নিত্য সম্পদলাভে অধিকতর সচেষ্ট হইতে হইবে। এই আন্তরিক কামনা কার্য্যে পরিণত করিবার যে অন্তরায় ছিল, এখন তাহা অনেকটা দূর হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা মথুরমোহনকে তিনি এতদিন ধরিয়া বিষয়-রক্ষণাবেক্ষণে বিশেষভাবে সুশিক্ষিত করিতেছিলেন। রাণীর যে দুহিতাটী গত হইয়াছে, সেই তৃতীয়া কন্যার সহিতই মথুরমোহনের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। সে সম্বন্ধ মৃত্যু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে, পাছে বিচক্ষণ বিষয় বুদ্ধি-সম্পন্ন সুচতুর মথুর তাঁহার পর হইয়া যায়,

এজন্য কনিষ্ঠা কন্যার সহিত রাণী তাঁহাকে পুনরায় পরিণীত করেন। বিষয়-রক্ষণাবেক্ষণে মথুর এখন তাঁহার দক্ষিণহস্ত। রাণী তাঁহার উপর অধিকতর ভার দিয়া আপনি ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তৃষ্ণা ত যায় না, দুর্ভাবনাও ফুরায় না। আজ কোথায় প্রজা বিদ্রোহী হইয়াছে, কাল কোথায় মোকদ্দমা বাঁধিয়াছে, এ সকল ভাবনা তাঁহার স্বপ্নের ভিতরেও সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। রাণী ভাবিলেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও বিষয়-সম্পর্ক বিষবৎ পরিহার করা ভিন্ন নিস্তার নাই। মরুসন্তপ্ত তরুর মত কতকাল আর অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইবেন? বহুদিন হইতে তাঁহার মনে ৺কাশীদর্শন লালসা জাগিয়াছিল। তাহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাণী এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যেখানে রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের রাজ-দরবার, তাপিতকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত জননী জাহ্নবী যথায় কোল পাতিয়া বসিয়া আছেন; কায়-মনের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য জগন্মাতা স্বয়ং যথা অন্নপূর্ণারূপে বিরাজমানা; যে অন্নছত্রে মহাযোগী মহাদেব ভিখারী, জ্ঞান-বৈরাগ্য সিদ্ধির জন্য মহাজ্ঞানী শঙ্কর বদ্ধাঞ্জলি, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিক্ষেত্রেও কি রাণীর অন্তরের বুভুক্ষা মিটিবে না? শ্বশ্রূর আদেশমত সুদক্ষ মথুর অকাতর ব্যয়ে কাশীযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। পূজার দ্রব্যসম্ভারে শতাধিক তরী পূর্ণ করা হইল। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বরাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন, জগন্মাতা আবির্ভূতা হইয়া বলিতেছেন, কাশী যাইবার প্রয়োজন নাই; গঙ্গাতীরে সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া আমার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপন কর। আমি তাহাতে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিত্য পূজা গ্রহণ

করিব। রাসমণি বিশ্বস্ত হৃদয়ে স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

মন্দির নির্ম্মাণার্থে যে স্থল দৈবাৎ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে পীরস্থান-সংলগ্ন কুর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি এক বিস্তীর্ণ কবরভূমি ছিল। এইরূপ শ্মশানই শক্তি-সাধনার পক্ষে প্রকৃষ্টরূপে প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। ক্রমে গঙ্গাতীরে বিস্তৃত সোপানরাজী প্রলম্বিত হইল। ইহার উভয় পার্শ্বে ত্রিশূল-শোভিত দ্বাদশ শিবমন্দির ভাগীরথীবক্ষে প্রতিবিম্ব বিস্তার করিয়া হাসিতে লাগিল। ক্রমে চক্রধর বিষ্ণুমন্দির দেবালয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থল অধিকার করিল এবং সর্ব্বোপরি নবচূড়-শোভিত দেবী-দেউল রাণীর অভ্রভেদী যশোকীর্ত্তির অনুরূপে সমুচ্চ রজতশিখরের ন্যায় গগন-প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া দাঁড়াইল। সন ১২৬২ সালের স্নানযাত্রার দিবসে রাণী দেবীপ্রতিষ্ঠার দিনস্থির করিলেন।

দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কার্য্যের সূচনা হইতেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণবতী, ভক্তিমতি রাণী কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন গ্রহণ, ভূতলে শয়ন এবং বিষয়কর্ম্ম বিরহিত হইয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার অভীষ্টদেবীর চিন্তা করিতেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিল। ইষ্টমূর্ত্তিকে নিয়ত আত্মবৎ সেবা করাই ভক্তের আন্তরিক অভিলাষ। রাণীর ঐকান্তিক কামনা, অন্নভোগ দিয়া জগন্মাতার নিত্য সেবা হইবে এবং সদ্‌ব্রাহ্মণগণ সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করিবেন। তাহাতে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। বঙ্গদেশের খ্যাতনামা যাবতীয় ব্রাহ্মণ একবাক্যে বলিলেন যে, বিগ্রহকে

অন্নভোগ দিবার ব্রাহ্মণেতর জাতির অধিকার নাই এবং কোন সদ্‌ব্রাহ্মণই সে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। বিধান শুনিয়া রাণীর চক্ষুতে শতধারা বহিল। উর্দ্ধমুখে যুক্তকরে জগজ্জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—অন্তর্য্যামী, তুমি জান, আমি নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার কাঙালিনী নহি। আমার আন্তরিক বাসনা তোমার সেবা। কিন্তু সে সেবা তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ না করিলে, আমার সাধ্য কি অর্পণ করি? দয়াময়ি, তুমি কি ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবে না?

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ ওলোট-পালট করিয়া মথুর বিধান আনাইতে লাগিলেন; শাস্ত্রমর্ম্ম তন্ন তন্ন করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল; কিন্তু রাণীর মনোমত বিধান কেহই দিল না, কোথাও পাওয়া গেল না। এদিকে প্রতিষ্ঠার দিন ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। হায়, অর্থবল এখানে একেবারে বিফল! হতাশের নিশ্বাস ভিন্ন এ নিদারুণ মনস্তাপে আর কোনই উপায় নাই। একটী একটী করিয়া যতই দিন যাইতে লাগিল, রাণীর ব্যাকুল মন ততই নিরাশাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। আশাভঙ্গে রাণী যখন নিরতিশয় কাতর, সেই সময় ঝামাপুকুরের এক ক্ষুদ্র টোল হইতে বিধান আসিল যে, প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি দেবালয় কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং তৎপরে প্রতিগ্রাহী যদ্যপি বিগ্রহের অন্নভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে শাস্ত্রের সম্মানও রক্ষিত হইবে আর ব্রাহ্মণদিগের প্রসাদান্ন ভোজনে কোন বাধা থাকিবে না। অভীষ্টলাভ করিয়া রাণী হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অপরাপর ব্রাহ্মণগণ এখনও বাধা তুলিতে বিরত হইলেন না।

বলিলেন, ঐরূপ বিধান সমাজরীতি-বিরুদ্ধ, সুতরাং কোন ব্রাহ্মণই রাণীর প্রদত্ত অন্নভোগ গ্রহণ করিবেন না। যাহা হউক, দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকার দেবত্র সম্পত্তি সহ দেবালয় গুরুবংশীয়-গণকে দান করিয়া বংশানুক্রমে রাণী তাহার তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শ্রেয় কার্য্যে বহু বিঘ্ন! রাণীর অভিপ্রেত সাধনে পুনরায় অন্তরায় উপস্থিত হইল। কোন সুযোগ্য সদ্ব্রাহ্মণ জগন্মাতার পূজকপদে ব্রতী হইতে চাহিলেন না। উপায়বিহীনা রাণী তখন পুনরায় ঝামাপুকুর টোলে পত্র প্রেরণ করিয়া শ্রীযুক্ত রামকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। ঘোর অন্ধকারে যিনি আশার আলোক দেখাইয়াছেন, এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর কে উদ্ধার করিবে? জগন্মাতার প্রতিষ্ঠাকার্য্য বন্ধ হইবে আর যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ হইয়া রামকুমার নিশ্চিন্ত থাকিবেন? উদারহৃদয়, দেবীভক্ত রামকুমার নিঃসঙ্কোচে প্রতিষ্ঠাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে স্নানযাত্রার পুণ্য দিন সমাগত হইল।

প্রতিষ্ঠার দিন সুপ্রভাত হইতে না হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর পল্লী মহোৎসবের মহোল্লাসে মুখরিত হইয়া উঠিল এবং উষারাগ ফুটিতে না ফুটিতে দেবালয়-প্রাঙ্গণ জনসঙ্ঘে পূর্ণ হইয়া গেল। দিনদেব প্রসন্নহাস্যে রাণীর পুণ্যকীর্ত্তির উপর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন। সহসা গভীর গর্জ্জনে শত শঙ্খরোল উথলিয়া উঠিল। শ্যাম-শ্যামা-মহেশ্বরের আজ একসঙ্গে প্রতিষ্ঠা। রাণীর পুণ্য মন্দির-প্রাঙ্গণ আজ শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবের সমন্বয় সভা। হরি-হরি হর-হর রবে, জগন্মাতার নামোৎসবে, ভক্তির ত্রিধারা-সঙ্গমে ভাগীরথী উথলিয়া উঠিয়া টল্‌টল্ করিতে লাগিলেন।

বিপুল সমারোহে শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। উদ্বেলিত হৃদয়ে, উচ্ছলিত নয়নে রাণী ইষ্টদেবীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

প্রেম-ভক্তির মহীয়সী মহিমায় রাণী আজ কল্পতরু। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়-অঙ্গন আজ অন্নপূর্ণার অন্নক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই অবারিত অন্নসত্রে গদাধর আজ উপবাসী! অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মীয়-স্বজনসকলের মতের বিরুদ্ধে যে বালক ধনীকামারিনীর অতুল্য বাৎসল্যের গুণে তাহার নিকট অঞ্জলি পাতিয়াছিল, শাস্ত্রবাক্যের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধায় আজ সে ব্রাহ্মণেতর জাতির নিকট অন্নভিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রামকুমার অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু গদাধর কোনমতেই স্বীকৃত হইল না। অনুপায় হইয়া অগ্রজ তখন বলিলেন, তা হ'লে সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে রন্ধন করিয়া খাও। গঙ্গার তীরে নীরে সকল বস্তুই শুদ্ধ হয়, তাহা ত মান? গদাধর আর কোন আপত্তি তুলিতে পারিল না। যাঁহার দর্শনে স্পর্শনে মানুষ নিষ্কলুষ হয়, যিনি পতিতপাবনী, শাস্ত্রবিগর্হিত অপরিমিত অপকার্য্যে মুক্তিদান করেন, তাঁহার কাছে শাস্ত্রাদেশ নগণ্য। বাস্তবিক, এই দেব-মানবের অলৌকিক জীবনে প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ভালবাসার কাছে সকল বিধি-নিষেধ-অনুশাসনই চিরদিন পরাজয় মানিয়াছে। আহারান্তে গদাধর ঝামাপুকুরে ফিরিয়া গেল। কিন্তু রামকুমারের আর তথায় ফেরা হইল না। দেবীভক্ত ব্রাহ্মণের ভক্তি, শ্রদ্ধা, আচার, অনুষ্ঠান দর্শনে একান্ত প্রীত হইয়া চিরস্থায়ীরূপে পূজকের পদে ব্রতী হইবার জন্য রাণী রাম-

কুমারকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামকুমার সে ঐকান্তিক আগ্রহ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু গদাধর তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য সবিশেষ মিনতি করিতে লাগিল। কোনরূপ যুক্তি তর্ক অনুজের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া রামকুমার অবশেষে 'ধর্ম্মপত্র' প্রথা অবলম্বন করিলেন। কোন কার্য্যের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হইলে, শাস্ত্রযুক্তি, বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা যখন মনকে সংশয়শূন্য করিতে পারে না, তখন পল্লীগ্রামে কখন কখন এই উপায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুইটি পর্ণে অথবা দুই টুক্‌রা কাগজে চন্দন বা আলতায় 'শুভ' 'অশুভ' কিম্বা 'হাঁ' 'না' লিখিয়া সংগোপনে একটী পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, ইহাই ধর্ম্মপত্র। পরে কোন শিশু দ্বারা উহার এক-খানি আকর্ষিত করাইয়া তাহাতে যেরূপ সিদ্ধান্ত দেখিতে পান, সরলাবিশ্বাসী পল্লীবাসীগণ তাহাকে দেবাদেশের ন্যায় গণ্য মান্য করেন! বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ধর্ম্মপত্রিকায় শুভফল নির্দ্দিষ্ট হইল। গদাধরের বিশ্বাসী হৃদয় আর কোনরূপ তর্ক যুক্তি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিল না। রামকুমার শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদে চিরস্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। অভীষ্টানুযায়ী ফললাভ করিয়া রাণীর আনন্দের অবধি রহিল না। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীকূলে রমণীয় উদ্যানসমন্বিত দেবালয়ে আসিয়া গদাধর সানন্দচিত্তে অগ্রজের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

---

(৬)

দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যে অলৌকিক শক্তির নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ। চুম্বকের ন্যায় ইহা তাঁহার স্বভাবধর্ম্ম এবং জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাল্যে যে শক্তি কামারপুকুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে গদাধরের অভিমুখে আকর্ষিত করিয়াছিল, কৈশোরে ঝামাপুকুরের গৃহস্থপল্লীতে যাহার অব্যর্থ সঞ্চার পাঠক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির দেবোদ্যানে তাহার অবাধ প্রভাব অনুভূত হইতে বিলম্ব হইল না। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেবের ন্যায় গদাধরের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি এবং তাহার খোলা-ভোলা-উদাস স্বভাব রাণীর জামাতা মথুরমোহনকে আকৃষ্ট করিল। জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুগত অথচ স্বাধীন ; স্ফূর্ত্তিবান অথচ নির্জ্জন-প্রিয় ; নম্র অথচ অমিত তেজঃসম্পন্ন ; সকলকে আকর্ষণ করে, কিন্তু স্বয়ং উদাস ; বয়সে যুবা, কিন্তু স্বভাবে শিশু এই প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণকুমার যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী মথুরের মনে অদম্য কৌতুহল উদ্দীপন করিবে, তাহা বিচিত্র কি? মথুর দেখিলেন, গদাধর তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়াও কৃপার ভিখারী নহে। তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে সে ত্রুটি করে না, কিন্তু এড়াইয়া চলে! তাহার এই বিচিত্র আচরণ মথুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, গদাধরের শরীর যে দেশে সঞ্চরণ করে, মন সে রাজ্যের অধিবাসী নহে। ইহার মুখ অরুণদীপ্ত অম্লান কমলের ন্যায় ঝলমল্ করিতেছে, কিন্তু বঙ্কিম চক্ষুদুটী যেন

পরমাগ্রহে ব্যগ্র হইয়া মহাশূন্যে কি অমূল্য বস্তুর অন্বেষণ করিতেছে। এ কি চায়? সে কি বস্তু? তাহা আর যাহাই হউক, পার্থিব কিছু যে নহে, সুচতুর মথুর তাহা অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন। ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, সংসারে যাহা কিছু লোভনীয়, লোকে তাহা লোকালয়েই অন্বেষণ করে। কিন্তু এই অদ্ভুত বালক লোকসঙ্গ হইতে দূরে চলিয়া যায়! মাছ ধরিবার সময় শীকারী যেমন একান্ত নিবিষ্টমনে ভাসমান ফাৎনার পানে চাহিয়া থাকে, মথুর দেখিতেন, দেবালয়স্থ নির্জ্জন পঞ্চবটীতলে গদাধর তেমনি যেন অগাধ জলে ছিপ ফেলিয়া ওৎপাতিয়া বসিয়া আছে। আবার কখন দেখা যায়, ইহার অধর দিব্য হাস্য-বিকশিত, কিন্তু চোখে মন্দাকিনী-ধারা। বালক গদাধর কৈশোর অতিক্রম করিলেও তাহাকে বালক ভিন্ন আর কিছুই মনে হইত না—কি এক ভাবে সে বিভোর হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ দেবকার্য্যে নিযুক্ত করিলে ইহার এই উদাস ভাব দূর হইতে পারে। দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবারের পরম-হিতৈষী মথুর গদাধরের অগ্রজ রামকুমারের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। সংসার-অনাবিষ্ট কনিষ্ঠের পক্ষে ইহা পরম সুযোগ বুঝিয়া মথুরের প্রস্তাব শ্রবণে রামকুমার প্রথমে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গদাধরের বিচিত্র চরিত্র চিন্তা করিয়া তখনি তাঁহার মন আশার উচ্চতম শিখর হইতে একেবারে হতাশের গভীরতম কূপে নিমগ্ন হইল। কনিষ্ঠের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে সকল কথা তিনি মথুরের নিকট অসংবৃতভাবে বিবৃত করিলেন। কিন্তু নিরুৎসাহিত হওয়া ত দূরের কথা, মথুরের সঙ্কল্প তাহাতে দৃঢ়তা হইল। গদাধরকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশকারী পদে

প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত তিনি সুযোগ-সংযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। গদাধরের ভাগিনেয় হৃদয়ের আগমনে সে শুভযোগ ত্বরায় উপস্থিত হইল।

হৃদয় গদাধরের পিস্তুত ভগ্নীর পুত্র। তাহার যেমন দীর্ঘ বলিষ্ঠ গঠন, তেমনি অকুতোসাহস, আর সে কনিষ্ঠ মাতুল গদাধরের তেমনি প্রিয়কারী। প্রায় সমবয়স্ক বলিয়া উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন নিরতিশয় দৃঢ় ছিল। কিন্তু এই প্রীতিবন্ধন যে কিরূপে গ্রন্থিবদ্ধ হইল, তাহা কল্পনা করা দুরূহ, কারণ পরস্পরের আকৃতি অথবা প্রকৃতিতে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। গদাধরের দেহ যেমন মৃণাল-কোমল, হৃদয়ের শরীর তেমনি বজ্র-কঠিন। গদাধর ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার অবয়বী মূর্ত্তি, হৃদয় ঠিক ইহার বিপরীত, সর্ব্বপ্রকার কল্পনাবর্জ্জিত। কিন্তু কর্ম্মী, উদ্যমশীল, উন্নতিকাম, সংসারিকতায় পূর্ণ ভাগিনেয়ের কাছে মাতুলের সংসার-বৈরাগ্য, আর্থিক ঔদাসিন্য এবং পারমার্থিক অনুষ্ঠানসকল যতই দুর্ব্বোধ হউক, হৃদয় আন্তরিক অনুরাগের সহিত তাহার পরম স্নেহপাত্র গদাধরের সেবা করিত। হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিল চাকরীর সন্ধানে। কিন্তু এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রকার শরীর-চেষ্টা-বিরহিত বালকস্বভাব মাতুলের সেবা করা তাহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। সে সাধ্যমত গদাধরকে চক্ষুর অন্তরাল করিত না।

হৃদয়কে সহচররূপে পাইয়া গদাধরের মনে কামারপুকুরের সেই স্বচ্ছন্দ বনবিহার, সেই ক্রীড়াচ্ছলে দেবদেবীমূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা প্রভৃতির স্মৃতি নবীনছন্দে জাগিয়া উঠিল। সে ভাগিনেয়কে

বলিল, মহাদেবের মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিবার সাধ হইতেছে। হৃদয়কে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না। ভাগীরথী হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া ছানিয়া বাছিয়া গঠনোপযোগী করিয়া দিল। পূজা আরম্ভ হইবার কিয়ৎকাল পরে দৈবাৎ মথুর তথায় উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, সাক্ষাৎ কৈলাসপতি যেন আজ প্রেমভিক্ষার অভিসারে ভাগীরথীতীরে উপনীত হইয়াছেন। মথুরের মনে হইল যেন সাধকের পূজা শেষ হইবামাত্র এখনি হর-করগত ঐ ডমরুধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইবে আর মহাদেববাহী মহাবৃষভ চলিতে আরম্ভ করিবে। মথুর স্থাণুবৎ অচল হইয়া মুগ্ধনেত্রে শিল্পীর সেই ভাবগঠিত নিখুঁত মনোহর মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ভক্তি ও বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া গেলেন। সেই জটাপুটিত ললাটতলে শশাঙ্ক তিলক, ধুস্তূরপুষ্প-শোভিত কর্ণযুগল, সেই প্রেম-করুণায় ঢলঢল অর্দ্ধোন্মেষিত ত্রিলোচন, প্রীতিস্ফুরিত, হাস্য-বিকশিত অধর আর সর্ব্বোপরি সমগ্রমূর্ত্তির সেই অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুরী মথুরমোহনকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। তারপর পূজকের কাতর করুণ আত্ম-নিবেদন, অশ্রুর শতধারে স্তবপাঠ, ভাগ্যবান্ মথুরের নয়নযুগলে শ্রাবণের প্রস্রবণ ছুটাইল।

পূজান্তে গদাধর যখন ভাব-বিভোর চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সময় মথুর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মূর্ত্তি কে গঠন করিয়াছে?

হৃদয় অঙ্গুলি নির্দ্দেশে মাতুলকে দেখাইয়া দিল—ইনি। মথুরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তাঁহার মনে হইল, রাণীর

বহুযত্ন-নির্ম্মিত নবরত্ন-দেউলে এই অমূল্য রত্ন প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে সকলই বিফল। গদাধরকে দেবপূজার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য মথুরের আগ্রহ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। শ্বশ্রূকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে তিনি হৃদয়ের নিকট হইতে মূর্ত্তিটি চাহিয়া লইয়া গেলেন।

একদিন গদাধর ও হৃদয় বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল, মথুরমোহন দূর হইতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতেছেন। মথুরের অভিপ্রায় গদাধরের অবিদিত ছিল না। ত্রস্ত হরিণ-শিশু ব্যাধের লক্ষ্য এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আজ মথুর তাহাকে পাশ কাটাইবার সুযোগ দিলেন না। গদাধর তাঁহার দৃষ্টির অন্তরাল হইতে না হইতে ভৃত্য আসিয়া বলিল, 'বাবু ডাক্‌ছেন।' ভীত মাতুলকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া হৃদয় তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গদাধর ভীতস্বরে বলিন, 'তুই জানিস নি, গেলেই এখনি আমাকে চাক্‌রী কর্‌তে বল্‌বে। মানী লোক, তার কথা অমান্য কর্‌তে পার্‌ব না।'

হৃদয় সবিস্ময়ে বলিল, 'মহতের আশ্রয়, এখানে কাজ করাতে দোষ কি, মামা? এ ত ভাল কথা। তুমি অমন কর্‌ছ কেন?'

মাতুল গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, 'একে ত চাক্‌রী কর্‌তে আমার ইচ্ছে নেই। তারপর দেব-দেবীর গায় দামী দামী সব অলঙ্কার আছে, তার হেঁপাজৎ করে কে? তুই পার্‌বি?'

'পার্‌ব' বলিয়া হৃদয় সানন্দে সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল। স্বভাব-বনচারী, স্বচ্ছন্দবিহারী হরিণশিশু ব্যাধের ফাঁদে পড়িল! মথুর কালবিলম্ব না করিয়া গদাধরকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশকারী-

পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ মাতুলকে সাধারণভাবে সাহায্য করিবার জন্য হৃদয়কে আদেশ দিলেন।

ভাগ্যবতী রাণী ইতিপূর্ব্বেই গদাধরের হস্তনৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়াছেন। গঠনে যাহার এমন অশিক্ষিত পটুত্ব, তাহার প্রসাধন যে অপূর্ব্বসুন্দর হইবে, ভক্তিমতি রাণী দিব্য চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। রাণীর ভাবপ্রত্যক্ষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে পরিণত হইল। রাসমণি জগন্মাতার নিত্য নববেশ নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলেন।

নিরাশার অকুল পাথারে আশার ক্ষীণালোক দেখিয়া রামকুমারের হৃদয়ও আনন্দে দুলিতে লাগিল। বার্দ্ধক্যের সঞ্চারে শরীর ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। পদ্মপত্রের জল টল্‌টল্ করিতেছে, কবে, কখন স্খলিত হইয়া পড়িবে, ঠিক কি? নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নাই। অপরিণামদর্শী মধ্যম সহোদর রামেশ্বর 'যা করেন রঘুবীর' বলিয়া এখনও নিশ্চিন্ত, উপার্জ্জন বা সাংসারিক উন্নতি-চেষ্টায় উদাসীন। কনিষ্ঠকে যে আশায় মাতৃকোল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কলিকাতায় আনিলেন, তাহা ফলবতী হওয়া ত দূরের কথা, গদাধরের তীব্র ঔদাসীন্যে সে আশালতা দিন দিন শুকাইয়া উঠিতেছে। কনিষ্ঠ সহোদর সংসারের একমাত্র ভরসা হইলেও তাহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে বাধা দেওয়া ধর্ম্মভীরু রামকুমার নিতান্ত গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার নিজের ভঙ্গুর দেহে আর যৌবনের উদ্যমশীলতা নাই। সংসারে রঘুবীর রহিয়াছেন, বৃদ্ধা মাতা আর তাঁহার নিজের অপগণ্ড সন্তান। কিন্তু যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া ইঁহারা রহিয়াছেন, তাহার খুঁটি ঘুণধরা, কখন

ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কে জানে! রামকুমার ভাবিয়া কূল পাইতে-ছিলেন না, ভাবনাও ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। অকূল অতলস্পর্শ সাগরে সন্তরণ করিতে করিতে পদতল সহসা তলসংলগ্ন হইলে মৃত্যুর দ্বারে জীবনের আশা যেমন ফিরিয়া আসে, গদাধরের কর্ম্মস্বীকারে রামকুমারের তাহাই হইল। রাণী ও মথুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। আজ জন্মাষ্টমী পর্ব্ব—নন্দোৎসব! সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে খোল করতাল ও রামশিঙারবে দক্ষিণেশ্বর বৃন্দাবন এবং রাসমণির মন্দিরভবন আজ নন্দালয়ে পরিণত হইয়াছে। যমুনা-সহচরী জাহ্নবী হরিদ্রাক্ত কলেবরে কলস্বরে হরিগুণগান করিতেছেন। মর্ম্মরাচ্ছাদিত শ্রীমন্দিরতল তৈল-হরিদ্রাতে পিচ্ছিল হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যাহ্ন-ভোগরাগের পর বিষ্ণুমন্দিরের পূজক ক্ষেত্রনাথ অতি সন্তর্পণে শ্রীশ্রীরাধারাণীকে শয়নমন্দিরে রাখিয়া আসিলেন। কিন্তু বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও শ্রীগোবিন্দজীকে স্থানান্তরিত করিবার সময় তাঁহার পদস্খলন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিগ্রহের একটী চরণ ভগ্ন হইল। সঙ্কীর্ত্তনের উচ্চরোল সহসা যেন ফুৎকারে নিবিয়া গেল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যেখানে আনন্দকোলাহল উঠিতেছিল, সেখানে মহাত্রাস বিরাজ করিতে লাগিল। পূজক ক্ষেত্রনাথ নিজের আঘাত ভুলিয়া আশ্রয়দায়িনীর অমঙ্গল-আশঙ্কায় হায় হায় করিতে লাগিলেন। অপরাধ এবং অকল্যাণ-ভয়ে রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। ভগ্ন বিগ্রহের পূজা নিষিদ্ধ—এখন অবশিষ্ট উৎসবেরই বা উপায় কি হয়, এবং নিত্যপূজারই বা কি ব্যবস্থা করা উচিত! কলিকাতার টোলে টোলে লোক ছুটিল। পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে

বলিলেন যে, 'ভগ্নমূর্ত্তি জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জন করিয়া অভিনব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাই বিধেয়।' নব বিগ্রহ গঠনের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু গণ্ডগোল প্রশমিত হইবার পর মথুরমোহন শ্বশ্রূর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মা, এ সম্বন্ধে একবার ছোট-ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলে হ'ত না?'

বেশকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মন্দিরের কর্ম্মচারীগণ গদাধরকে ছোট, এবং রামকুমারকে বড় ভট্টাচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। নিদ্রাভঙ্গে লোক যেমন চকিত হইয়া উঠে, ভ্রান্তির চমকভঙ্গে রাণী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'এখনি।'

গদাধর এই সময় কখন কখন ভাবাবিষ্ট হইত। মথুর কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া উত্তর দিল, 'যদি রাণীর জামাইদের কারুর পা ভেঙ্গে যেত, তা হ'লে তার চিকিৎসা করানো হ'ত, না, আর একজনকে তার জায়গায় বসাতেন? বিগ্রহের পা ভেঙ্গে গেছে, সংস্কার করাও। ত্যাগ কর্‌বে কেন?'

বিধান শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু বিচক্ষণ মথুর ও বিবেকবতী রাণী অন্তরে অন্তরে এই বিধান হৃদয়ঙ্গম করিলেন। বুঝিলেন যে, আত্মবৎ সেবা যেখানে কামনা, সেখানে এই ভিন্ন অন্য ব্যবস্থা করিলে প্রত্যবায় হইবে। হৃদয়ের প্রীতি অনুরাগ দিয়া এতদিন যাহাকে সেবা করিয়াছেন, সেই প্রিয় মূর্ত্তিকে ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া রাণীর হৃদয় নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। গদাধরের অনুকূল বিধানে তাঁহার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর এক চিন্তা—ভগ্ন বিগ্রহ সুচারুরূপে সংস্কার করিতে সমর্থ, এমন সুদক্ষ কারিকর কোথায় পাওয়া যায়?

এই জটিল প্রশ্ন হৃদয়ই সমাধান করিয়া দিল। যিনি বিধান দিয়াছেন, তিনিই সংস্কার করিয়া দিবেন। গদাধর যেমন গঠন-পটু, তেমনি সংস্কার-দক্ষ।

মথুরমোহনের অনুরোধে গদাধর সংস্কার-কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করিল। দক্ষিণেশ্বর-বিষ্ণু-মন্দিরে এখনও সেই সংস্কৃত বিগ্রহের পূজা হইতেছে।

এই ভগ্ন বিগ্রহ সম্বন্ধে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করায় গদাধর উত্তর দিয়াছিল, 'তোমার কি বুদ্ধি গো! যিনি অখণ্ড-মণ্ডলাকার, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, তাঁকে বল্‌ছ ভাঙা!'

---

(৭)

শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর ভগ্নপদ পুনঃ সংস্কৃত হইল, কিন্তু তাঁহার পূজক ক্ষেত্রনাথের ভাঙ্গা কপাল আর জোড়া লাগিল না। ভগ্নপদই ক্ষেত্রনাথের পদচ্যুতির কারণ হইল। হৃদয়রামকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বেশকার নিযুক্ত করিয়া মথুর গদাধরকে বিষ্ণু-মন্দিরের পূজকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রামকুমার দেখিলেন, গদাধরের বহু বিশৃঙ্খল আচরণ সত্ত্বেও তাহার উপর রাসমণি এবং তাঁহার জামাতার আকর্ষণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। মথুর উদ্যানে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের অন্বেষণ করেন। রাসমণি দেবালয়ে আসিলে ছোট-ভট্টাচার্য্যের গান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন। রাজরাণী—ভিক্ষুক হইতে উৎকৃষ্ট কলাবৎ কতবার তাঁহাকে কত গান

শুনাইয়াছে। কিন্তু এই অশিক্ষিত, আত্মবিস্মৃত, উদাস-চিত্ত যুবকের সঙ্গীত কি সুমধুর! ইহার গান শুনিতে শুনিতে তন্ময় হৃদয় যেন সুধার লহরে দুলিতে দুলিতে উদাস হইয়া কোথায় ভাসিয়া যায়! মনে হয়, শ্রীমন্দির যেন ভাবের আবেগে টল্‌মল্ করিতেছে! মনে হয় যেন দেবতা কান পাতিয়া মাতৃহারা বালকের কাতর ক্রন্দন শুনিতেছেন! ভাব-বিভোরা, ভক্তি-বিহ্বলা রাণী অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান। মায়ের পূজার ভার যে ভবিষ্যতে গদাধরের উপর আরব্ধ হইবে, সে সম্বন্ধে রামকুমারের সন্দেহ রহিল না। তিনি বিশেষ যত্নে কনিষ্ঠকে পূজাকার্য্যে সুশিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজা-পদ্ধতি সম্যকরূপে আয়ত্ব করিতে মেধাবী যুবকের কালবিলম্ব হইল না। কিন্তু রীতি পদ্ধতি প্রণালী যতই বিশুদ্ধ হউক, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে শক্তি-পূজার প্রকৃষ্ট অধিকার হয় না জানিয়া গদাধর দীক্ষিত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সহোদরের সৎসঙ্কল্পে সাগ্রহে সম্মতিদান করিয়া রামকুমার উপযুক্ত আচার্য্যের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আচার্য্য নির্ব্বাচিত হইলেন, কেনারাম ভট্টাচার্য্য। দীক্ষার দিন স্থির হইল।

সাধক-জীবনের পরম সম্পদ ইষ্টমন্ত্র লাভ হইবে, আজ গদাধর পরমানন্দে বিভোর। শিষ্যের পারমার্থিক কল্যাণ-কামনায় আচার্য্য যখন বিধি-অনুরূপ পূজার্চ্চনাদি শেষ করিয়া মন্ত্রদান মানসে তাহাকে তাঁহার আসন-সমীপে উপবিষ্ট হইতে আদেশ করিলেন, গদাধরের মুখমণ্ডল তখন এক অপূর্ব্ব বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং দিব্য ভাবাবেশে তখনি তাহার বাহ্য চৈতন্য

বিলুপ্ত হইয়া গেল। মন্ত্রশক্তির এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রভাব অথবা আদানের আশ্চর্য্য পরিণাম পূর্ব্বে কখন কেনারামের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তাঁহার বিস্মিত নেত্র একাগ্র হইয়া শিষ্যের মুখমণ্ডল-নিবিষ্ট হইয়া রহিল এবং গদাধর পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তিনি হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া অজস্র শুভাশী-র্ব্বচনে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন।

রামকুমারের অনুমান অচিরেই সত্যে পরিণত হইল। দীক্ষা গ্রহণের পর কয়েক দিন ক্রমান্বয়ে গদাধরকে অগ্রজের স্থলে দেবীপূজা-কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া মথুরের অনুরোধে রাণী তাহাকে স্থায়ীরূপে দেবীপূজায় ব্রতী করিয়া দিলেন। অনুজের পরিবর্ত্তে রামকুমার বিষ্ণু মন্দিরে পূজকের আসন গ্রহণ করিলেন।

হৃদয়রাম বেশকার, গদাধর পূজক, শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। দেবীপূজার শ্রমসাধ্য অনুষ্ঠান হইতে অব্যাহতি পাইয়া রামকুমারের শ্রমক্লান্ত দেহ কথঞ্চিত আরাম লাভ করিল বটে, কিন্তু বৃদ্ধ শরীর আর যেন বহিতে চায় না। আবার সংসার-সমর-শ্রান্ত মনও ক্রমে যেন বিশ্রাম চাহিতেছে। অনেকদিন জননীর চরণদর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তার উপর তাঁহার মাতৃহীন শিশুর স্মৃতি আর সর্ব্বোপরি গৃহদেবতা রঘুবীরের দর্শন-পিপাসা প্রবল আকর্ষণে তাঁহাকে গৃহাভিমুখে টানিতে লাগিল। হৃদয়রামকে বিষ্ণু-মন্দিরে তাঁহার পরিবর্ত্ত কল্পনা করিয়া রামকুমার কিছুদিনের বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মথুর তাঁহার কল্পিত নিয়োগে সম্মতি দান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। গদাধর এবং হৃদয়রামকে

সাবধানতার সহিত দেবকার্য্য সম্পন্ন করিতে উপদেশ দিয়া রামকুমার ভবতারিণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিদায় তাঁহার চিরবিদায় হইল। মূলাজোড়ে বিশেষ কোন কার্য্য ছিল। রামকুমার স্থির করিলেন, অগ্রে তাহা সমাধা করিয়া জন্মভূমি অভিমুখে যাত্রা করিবেন। কিন্তু মূলাজোড়ে পৌছিবার পর মৃত্যুর আহ্বানে তাঁহাকে মহাপথে যাত্রা করিতে হইল। কণ্টকিত সংসার-কাননে পর্য্যটন-ক্লান্ত পান্থ এতদিনে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। কামারপুকুরের ক্ষুদ্র কুটীরে আবার করুণ ক্রন্দন-রোল উঠিল।

ক্ষুদিরামের যখন দেহান্তর হয়, গদাধর তখন নিতান্ত বালক। রামকুমার তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলেন। সুতরাং পিতৃ-প্রতিম সহোদরের মৃত্যু গদাধরকে নিরতিশয় ব্যথিত করিল। এক বৎসর পূর্ব্বে সহোদর কি বিপুল উৎসাহে দেবালয়ের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরঘুবীরের সেবা চিন্তা, বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ, বালক পুত্রের লালনপালন, সহোদরদ্বয়ের হিতৈষণা, আত্মীয়-স্বজনগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি—এক দিনে, এক মুহূর্ত্তে সব শেষ! মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উদ্যম, অভিসন্ধি; ভোগ, বিলাস; অহঙ্কার, আধিপত্য; প্রতিষ্ঠা, গৌরব, সকল উপহাস করিয়া মাথার উপর মৃত্যুর বিজয়-ডঙ্কা বাজিতেছে, আর সে নিঃশঙ্কায় সুখের কল্পনায় দূরাপসারিণী ছায়ার পশ্চাতে ধাবিত! এ কি বাতুলতা—মত্ততার প্রয়াস! মাতাল নেশার ঘোরে আপনাকে ভুলিয়া যায়। কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, জানা নাই—"অব্যক্তাদীনি ভূতানি,

ব্যক্ত মধ্যানি, ভারত!”—আগু পাছু অন্ধকার, মাঝে ক্ষণিকের জন্য বায়ুপুষ্ট বুদ্বুদের উদ্ভব, বায়ুর উপর তার আয়ু প্রতিষ্ঠিত—বাসনার ঊনপঞ্চাশ পবন চালিত—কিছুক্ষণ হেলে-দোলে-খেলে, তারপর জলে জল মিশাইয়া যায়। অনিত্য অনিত্য, সকলই অনিত্য! অনিত্য দেহ, অনিত্য সংসার। অনিত্য সংসারে অনিত্য সুখের কামনা। কোথায় সুখ? তৃষ্ণার মরীচিকা! সুখের সন্ধানেই যত দুঃখের উৎপত্তি। স্ত্রী পুত্র সম্পদ যা কিছু সুখের আস্পদ,—হয় ফেলে পলাতে হয়, নয় ফেলে পলায়। লক্ষ্মী চপলা, জীবন চঞ্চল, তবু নশ্বর ইন্দ্রিয়-লালসায় বিকল, কামিনী-কাঞ্চনশক্তি প্রবল। যৌবন জরায় গ্রাস করে, ইন্দ্রিয় শক্তিহীন হয়, তবু মোহ ভাঙ্গে না। অদ্ভুত মোহ!—যে এই অনিত্য-ভোগে উদাসীন, কাম-কাঞ্চনে অনুরাগহীন, তাকে নির্ব্বোধ মনে করে। কাক বড় চতুর, কিন্তু বিষ্ঠাভোজী! চোখের উপর দেখে, ছায়া-বাজী—চক্ষুর নিমেষে মিলিয়ে যায়—তবু মায়া ঘুচে না। বিচিত্র মায়া! যাকে ভূতে পায়, সে যদি বুঝ্‌তে পারে, তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হলে ভূত পলায়। জাগ্‌লে দুঃস্বপ্ন কেটে যায়। স্বপ্নের শৃঙ্খলে সিংহশিশু আবদ্ধ, কিন্তু বন্ধন অতি কঠিন। জন্মে জন্মে পাকে পাকে দৃঢ় আবদ্ধ। একবার ঘুম ভাঙ্‌লে এ স্বপ্ন ছুটে যায়, শৃঙ্খল খসে পড়ে, সিংহশিশু মুক্তি পায়। কিন্তু কাল ঘুম ভাঙ্গে না, কেউ জাগে না! ঘোর রজনী, সব অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বিবেক-বৈরাগ্যের অরুণোদয় না হলে মায়ার ঘুম ভাঙ্‌বে না।—“যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।” ভ্রান্ত মানব ভাবে, যোগ ও ভোগ একত্রে

সাধন করিব। কিন্তু দিবা-রাত্রি, বহ্নি-বারির একত্র সমাবেশ কদাচিৎ যদি সম্ভবপর হয়, তথাপি এ অসাধ্য-সাধন দুষ্কর।

জ্যেষ্ঠ সহোদর লোকান্তরিত হইবার পর গদাধর উগ্রতর সাধনায় নিমগ্ন হইল। হৃদয় দেখিল, তাহার প্রিয়তম মাতুলের স্বভাব দিনে দিনে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার মন যেন সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন, মুখে সে মিষ্ট আলাপ, অধরে সে সুমধুর হাসি নাই। সূর্য্যের কর যেমন সুগভীর সাগরতল আলোকিত করে না, সংসারের কোন আনন্দই তেমনি গদাধরকে পুলকিত করিতে পারে না। লোক-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলে যেন তাহার স্বস্তি বোধ হয়। যতক্ষণ দেবীর পূজার্চ্চণা, ভোগরাগ প্রভৃতির প্রয়োজন, গদাধর ততক্ষণ মন্দিরে অতিবাহিত করে, কিন্তু মধ্যাহ্নে মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হইলে সে যে কোথায় অন্তর্হিত হয়, হৃদয়ের সতর্ক নেত্রও সহসা তাহার সন্ধান পায় না। ভাগিনেয় দেবীর প্রসাদ লইয়া মাতুলের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। শ্রমের পর ক্ষুধায় তাহার জঠর আহুতি-লোলুপ বহ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু মাতুলের উদর একেবারে নির্ব্বিকার, ভোজনের উত্তেজনায় সম্পূর্ণ উদাসীন ; ক্ষুধা বলিয়া যে আধিভৌতিক একটা উপদ্রব আছে, গদাধর তাহার শান্তি করিয়াছে। একদিন হৃদয়ের সোৎসুক ইতস্ততঃ-সঞ্চরণশীল চক্ষুদ্বর দেখিল, গদাধর পঞ্চবটী-সন্নিহিত জঙ্গল হইতে বহির্গত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, তুমি না খেয়ে তিন-পহরকে উথান্‌কে গিছিলে কেন ?" মাতুল প্রশ্ন এড়াইয়া উত্তর দিল, "এই একটু গেছনু।" সহিষ্ণু হৃদয় তাহার প্রিয় মাতুলের সর্ব্বপ্রকার বিশৃঙ্খলতা নীরবে সহ্য করিত। বিশেষ গদাধরের

গম্ভীর মুখ দেখিলে সে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু গদাধর ক্রমে তাহারও ধৈর্য্য লঙ্ঘিয়া গেল। একদিন মধ্য-রাত্রে সে দেখিল, মাতুল শয্যায় নাই। এখনই আসিবে আসিবে করিয়া হৃদয় অনেকক্ষণ সজাগ রহিল, কিন্তু গদাধর ফিরিল না। ক্রমে নিত্য এই ঘটনার পুনরাভিনয় দেখিয়া ভাগিনেয় আর তাহার কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। একদিন মাতুলের শয্যাত্যাগের পর সন্তর্পণে উঠিয়া নিঃশব্দে বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাত্রি সুগভীর হইয়াছে। সমস্ত দেবালয় নিস্তব্ধ। ছায়া-লোকাঙ্কিত উদ্যান যেন চিত্রিত স্বপ্নের মত প্রতীয়মান। অদূরে দ্বাদশ শিবমন্দির উন্নতশীর ভৈরবের ন্যায় সজাগ প্রহরীরূপে দেবী-দেউল রক্ষা করিতেছে। বাগানে টুঁ শব্দ নাই। কেবল ঝিল্লীদল বিভোর হইয়া বিশ্ব-জননীর বন্দনাগান গাহিতেছে। আর হরশির-বিহারিণী সরিদ্বরা জাহ্নবী যেন দেবদেবের মন্দিরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তাহার তলদেশে মৃদুমন্দ আঘাত করিতেছেন। হৃদয় দেখিল, মাতুল ব্যগ্র পদে পঞ্চবটী-অভিমুখে চলিয়াছে। সেও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে গদাধর জঙ্গলের ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল।

হৃদয় মাটীর দেহ লইয়া মাটীর পৃথিবীতে বাস করে, আধ্যাত্মিক-রাজ্য তাহার কাছে অতলস্পর্শের ন্যায় অগোচর। মাতুলের দেহ একে দেবসেবার শ্রমে কাতর, তাহাতে একপ্রকার অনাহারক্লিষ্ট, তার উপর এই রাত্রি-জাগরণ! গদাধরের যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, হৃদয়ের মন ততই ভয় ও চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সহসা জঙ্গলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া মাতুলের সম্মুখীন হইতেও তাহার সাহস হইল না। দীর্ঘকাল চুপ করিয়া থাকাও তাহার বলিষ্ঠ দেহ ও উদ্যমশীল চঞ্চল স্বভাবের পক্ষে অসম্ভব। সে মাতুলকে ভয় দেখাইবার জন্য ঢিল ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু জঙ্গলের ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না।

ভাগিনেয় নিত্য এইরূপ উৎপাত করিতে লাগিল। মাতুল তাহা বুঝিয়াও কিছু বলিল না। অবশেষে নীরব থাকা হৃদয়ের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। একদিন মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "মামা, উখান্‌টা উপদেবতার স্থান, তুমি নিত্যি উখান্‌কে কেনে যাও বল দিকি?" মাতুল উত্তর দিল, "ঐ খানে একটা আমলকী গাছ আছে না? তার তলায় ধ্যান করলে যে যা মনে করে বসে, তাই সিদ্ধি হয়, তাই বসি।"

গদাধরের উত্তর শুনিয়াও হৃদয় লোষ্ট্র নিক্ষেপে বিরত হইল না। মাতুলকে কোন মতে নিরস্ত করিতে না পারিয়া সে এক-রাত্রে তাহার পশ্চাদ্‌গমন করিয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং কিছুদূর হইতে দেখিল, গদাধর পৈতা, বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমলকী-তলায় ধ্যান করিতে বসিল। মাতুলের সৃষ্টিছাড়া আচরণ দেখিয়া হৃদয়ের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। হয় ত একটু ভয়ও হইল—কে জানে উপদেবতার কাণ্ড কি না? কিন্তু মাতুলের কল্যাণের জন্য নির্ভীক হৃদয় কোন উপদেবতার সহিত সংগ্রামে ভীত বা অপ্রস্তুত নহে। জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, ই কি কাণ্ড? পৈতা ফেলে ল্যাংটা হয়ে বসেছ কেন? মামা, মামা গো।" অনেক চেঁচাচেঁচির পর গদাধরের ধ্যান-বিলুপ্ত বাহ্য-চৈতন্য ফিরিয়া

আসিল। ক্ষণিক ভাগিনেয়ের মুখ চাহিয়া বলিল—"হৃদু, তুই জানিস নি। অষ্ট পাশ মুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। ঘৃণা লজ্জা, ভয়, জাতি-অভিমান, সব ত্যাগ করতে হয়। ধ্যান করা শেষ হলে পৈতা, কাপড় সব পরে ফিরে যাব।"

(৮)

হৃদয় ছায়ার ন্যায়, গদাধরের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া মাতুলের আচার অনাচার অত্যাচারসকল লক্ষ্য করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সুতীক্ষ্ণ প্রখর দৃষ্টিও বাস্তব-রাজ্যের মায়াবরণ ভেদ করিয়া অতীন্দ্রিয় জগতে পৌঁছাইতে পারিল না। হৃদয় হঠকারী, চিন্তায় অনভ্যস্ত ; অতশত না ভাবিয়া আপাততঃ স্থির করিল যে, অন্নদাতা প্রভুর দৃষ্টি হইতে মাতুলের দুর্ব্বোধ আচরণসকল যথাসম্ভব সম্বরণ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু তাহারই বা উপায় কি ? গদাধরের নানা অসংলগ্ন কার্য্যকলাপের উপর দেবালয়ের কর্ম্মচারীগণের সংশিত দৃষ্টি পড়িয়াছে। বড় অশান্তিতেই হৃদয়ের দিন কাটিতে লাগিল। কখন মনে হয়, আর পারিনা। কিন্তু তখনই কামারপুকুরের সেই দরিদ্র পরিবার, বৃদ্ধা দিদিমা চন্দ্রাদেবীর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, তাঁহার সরল উদার অপার্থিব স্নেহ, আর হৃদয়ের বিশাল বক্ষ ভক্তির সহস্র ধারায় প্লাবিত হইয়া যায়! দৈন্যের দুর্ব্বহ ভার বহন করিতে করিতে বড়মামা অন্তিমে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। মধ্যম মাতুল ত মানুষ হইলেন না—না সংসারী, না উদাসী! কনিষ্ঠ মাতুলই এখন দরিদ্র সংসারের আশ্রয়, ভরসা, অবলম্বন-দণ্ড।

হৃদয় যে কি করিবে, কাহার পরামর্শ লইবে, কিছুই কুলকিনারা করিয়া উঠিতে পারে না। আবার জ্বালার উপর জ্বালা, এই উন্মাদ বালক হৃদয়ের পুরুষ হৃদয় স্নেহের শতপাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে! ইহাকে তেল মাখাও, স্নান করাও, মুখে তুলিয়া দিয়া খাওয়াও! কে হে বাপু তুমি আমার বাপের ঠাকুর? কিন্তু বাপের ঠাকুরই বটে! শারীর চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন বালকের মুখে আহার তুলিয়া না দিয়া কি মুখে অন্নজল রুচে? মনে হয়, ইহাকে কোথায় রাখি? অস্থি-পঞ্জরময় মানব-বক্ষে ইহার মৃণাল-কোমল অঙ্গে বেদনা অনুভব হইবে। বিহঙ্গ যেমন বক্ষ পাতিয়া পক্ষাবরণে প্রাণপণে নিজ শাবককে রক্ষা করে, হৃদয় তেমনি অতি যত্নে মাতুলকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং পাছে গদাধরের বিসদৃশ আচরণসকল প্রকাশ হইয়া পড়ে তজ্জন্য যক্ষের মত সজাগ এবং সদা সতর্ক হইয়া রহিল। কিন্তু কতই বা আর সাবধান হওয়া যায় —এ যে নিত্য নূতন তরঙ্গ! কোনদিন পূজার আসনে বসিয়াই গদাধর ধ্যানস্থ—চিৎকার করাও দায়, চেতাইয়া তুলাও দুর্ঘট! আবার তাহাও যদি কোন প্রকারে সম্পন্ন হইল ত আরত্রিক আর ফুরায় না। বাদকদিগের হাত ভারিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাপিয়া চৈতন্যবিহীন গদাধরের শ্রীহস্ত সমভাবে চলিয়াছে! এ পক্ষে নিবৃত্তির কোন লক্ষণই নাই, ও পক্ষে প্রসাদলোলুপ কর্ম্মচারীগণ একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! হায় হায়, ক্রিয়াকাণ্ড সব পণ্ড হইল! আশঙ্কায় হৃদয়ের অন্তর দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতে থাকে। ক্রমে দুশ্চিন্তায় হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। অবশেষে একদিন সকল শঙ্কা সকল ভাবনার

সমাধান করিয়া তাহার বাতুল মাতুল আপনা হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিলেন। মথুরমোহন স্বয়ং সেদিন দেবালয়ে উপস্থিত।

কি এক অনৈসর্গিক আকর্ষণ যে সুশিক্ষিত, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ধনবান রাজ-জামাতাকে এই দীন, নিরক্ষর, অর্দ্ধোন্মাদ, প্রাপ্তবয়ঃ বালকের অভিমুখে উন্মুখ করিয়াছিল, তাহা বলা বড় কঠিন! কিন্তু তাঁহার আচরণে প্রকাশ যে, এই বিষম বিপরীত সম্বন্ধ উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতর বৈ কখন শিথিল হয় নাই। মথুর এখন ঘন ঘন দেবালয়ে আসনে তাহাকে দেখিবার জন্য, কদাচিৎ তাহার দুষ্প্রাপ্য সঙ্গসুখ-লালসায়। অন্যসকলে গদাধরকে ছোট-ভট্‌চায্‌ বলে, মথুর তাহাকে পার্থিব শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করেন। আজ মথুরমোহন দেখিলেন, দ্বাদশ শিব-মন্দিরের কোন এক মন্দিরের সম্মুখে দেবালয়ের কর্ম্মচারী বর্গ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া সাতিশয় উৎসাহসহকারে কি আলোচনা করিতেছে। মথুর কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া নিকটে আসিয়া দেখিলেন, গদাধর গদগদ ভাষে মহিম্নঃ-স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহার শরীর টল্‌মল্‌ করিতেছে; যুক্তকর, শিবলিঙ্গের উপর চিত্রার্পিতের ন্যায় নিবদ্ধ দৃষ্টি, আর সেই নিষ্পলক নেত্রদ্বয় হইতে মুখ, বুক, বসন ভাসাইয়া অবিরল জলধারা মন্দির-তল সিক্ত করিতেছে। সহসা আকুল ভাবোচ্ছ্বাসে স্তবপাঠ বন্ধ হইয়া গেল। গলিত ভাষে গদাধর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, মহাদেব গো তোমার অসীম গুণের কথা আমি কেমন করে বল্‌বো! তাঁহার উত্তরোত্তর ভাব-বিহ্বলতা দেখিয়া কর্ম্মচারীবর্গ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, 'এ ত বড় বাড়াবাড়ী

করলে হে, শেষে কি একটা কাণ্ড করে বসবে! এই বেলা টেনে বার করে আন!' মথুর সেই মুহূর্ত্তেই অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'খবরদার! যার মাথার ওপর আর একটা মাথা আছে, সেই যেন এখন বাবাকে স্পর্শ করে।' চকিত হইয়া সকলে নিমেষে অন্তর্ধান হইল। মথুর প্রহরীর ন্যায় মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। বহুক্ষণ পরে ভাবভঙ্গে গদাধর প্রশ্ন করিলেন, 'মথুর, আপনি ইখানকে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু অন্যায় করে ফেলেছি কি?' মথুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'কিছু না, বাবা, আপনি স্তব পড়ছিলেন, পাছে কেউ বিরক্ত করে, তাই দাঁড়িয়ে আছি।'

মথুরমোহনের সদয় ভাব দেখিয়া হৃদয় আপাততঃ কতকটা আশ্বস্ত হইল বটে, কিন্তু তাহার আতঙ্ক একেবারে দূর হইল না। ভাবিয়া রাখিল, বুঝাইয়া সুঝাইয়া যেমন করিয়া হউক, মামাকে এইরূপ আতিশয্যের বিকাশ হইতে নিরস্ত করিতে হইবে। কোন কাজেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। তার উপর মথুর বড়মানুষ, সহজেই অব্যবস্থিত চিত্ত; আজ প্রসন্ন আছে, কাল বিমুখ হইবে; তখন? কিন্তু যাঁহার সম্বন্ধে হৃদয়ের অন্তর নিরন্তর শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার ত কোন দিকে কাহাকে ভ্রূক্ষেপ নাই! আজ শিবমন্দিরে কাঁদিয়া হাট বসান, কাল কালীমন্দির ভাসান! পূজা করিতে বসিয়া কোথায় রহিল পুষ্প-চন্দন, আরতি-বন্দন! কেবল ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস আর হা-হুতাশ!—মা, কৈ তোর দেখা পেলাম্! সত্য, সে আকুল ক্রন্দন শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়! কিন্তু মন্দিরের ঐ পাষাণী ত তাহাতে কর্ণপাত করিতেছে না!

ইনি কি তবে মা নন্? তবে কার পূজা করিতেছি? ঐ যে শ্বেত সহস্রদলশায়িত শিবোপরে ষোড়শী—সব্যে বরাভয়, বামে অসি-মুণ্ডধারিণী, নরশিরহারিণী, গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা; সুকেশিনী, সুহাসিনী, শশিশেখরা; দিব্যাম্বরা, নীলোৎপলবরণা, ঢলঢল ত্রিলোচনা—ইনি মৃণ্ময়ী না চিন্ময়ী? মানবের আর্ত্ত প্রার্থনা, আকুল রোদন কি ইহাঁর কর্ণগোচর হয় না? যদি হয়, তবে আমি কেন সাড়া পাই না?

ক্রমে যতই দিন বহিতে লাগিল, গদাধরের আচরণ ততই অদ্ভুততর হইয়া উঠিল। বাগানের কর্ম্মচারীবর্গ কত কথা কানাকানি করে। কেহ বলে প্রেতাবেশ, কেহ বলে বায়ুরোগ। হৃদয় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; গদাধরের কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই—কেবল মা—মা—মা! বক্ষে আকুল উদ্বেগ, চক্ষে শ্রাবণের ধারা, মাতৃহারা পাগল কখন দৈবী-দেউলে, কখন গঙ্গাকূলে, কখন পঞ্চবটীমূলে অসংবৃতভাবে 'মা—মা' বলিয়া বিলাপ করে। সে করুণ ক্রন্দনে পবন উতলা হইয়া উঠে, বৃক্ষবল্লী চঞ্চল হয়, আবেগে ভাগীরথী-হৃদয় দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উথলিয়া উঠে! আত্মহারা পাগলের লজ্জা ভয় সঙ্কোচ কিছুই নাই! তীব্র ব্যাকুলতায় কখন কণ্টকে লুটাইয়া, বালীতে মুখ ঘষিয়া শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়। অশ্রুর সহিত শোণিতধারা ধরাসিক্ত করিতে থাকে। হৃদয়ের চক্ষে শতধারা বহে, অশ্রুসিক্ত স্বরে 'মামা' 'মামা' বলিয়া ডাকে, কিন্তু পাগলের হুঁস নাই। অনাহার, অনিদ্রায় দিবারাত্রি বহিয়া যায়, কিন্তু পাগলের সমভাব। কেবল সন্ধ্যাসমাগমে শঙ্খ-ঘণ্টা-রোলে যখন জাহ্নবীকূল প্রকম্পিত হইতে

থাকে, পাগল পশ্চিম গগনের রক্ত আভার প্রতি চাহিয়া হাহাকার করিয়া উঠে—ঐ ত, মা, নর-পরমায়ু হরণ করিয়া আর একদিন চলিয়া গেল, তোমার দেখা কৈ পেলাম, জননি! এত সাধি, এত আমি কাঁদি, কৈ তোমার দয়া হয়!

একদিন দেবীসমক্ষে রামপ্রসাদের গীত গাহিতে গাহিতে পাগল অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মা, তুমি রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলে, আমায় কেন বঞ্চিত কর। দেখা দাও, দেখা দাও! দেখা দেবে না? তবে বৃথা কেন এ পশুজীবন বহন করি। বলিতে বলিতে সহসা গদাধরের উন্মাদ দৃষ্টি বলিদানের খড়্গের উপর পতিত হইল। পাগল আর কালবিলম্ব করিল না। মায়ের সম্মুখে আত্মবলি দিবার উত্তেজনায় ছুটিয়া গিয়া খড়্গ তুলিয়া লইল। কিন্তু আঘাতোন্মুখ হইবামাত্র মনে হইল, যেন ঘর-দ্বার-দেবমন্দির, বৃক্ষ-বল্লী, উদ্যান, জীবজন্তু-কলরব, সব ক্রমে ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া মহাশূন্যে মিশাইয়া যাইতেছে, এবং সেই শূন্য পূর্ণ করিয়া এক অন্তহীন 'চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র' বিরাট্ তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, আলোকে আলোকে উচ্ছ্বাস তুলিয়া, বুকের উপর আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে! যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথাও কিছু নাই—"ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্র তারকং'—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে অণু, পরমাণু কিছুই নাই; আছে কেবল পুলক-ঝলসিত, চিৎ-শক্তি-বিলসিত জ্যোতিঃ-সাগরের অগাধ অপার বিস্তার, আর সেই অপূর্ব্ব আনন্দময় আলোক-সিন্ধুর মাঝে এক চিদ্‌ঘন আনন্দময়ী মূর্ত্তি—বরাভয়করা, অসীম করুণায় মৃদুমন্দ হসিতাধরা! গদাধর 'মা মা' বলিতে বলিতে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু অদর্শন বরং ছিল ভাল, চপলার ন্যায় এই চকিত দর্শনে আমাদের দিব্যোন্মাদ পুরুষ আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পুনর্দর্শনের ব্যাকুল লালসা তাঁহাকে আরও আকুল করিয়া তুলিল। কেবল মা আর মা, আর অবিরাম রোদন—কখন অব্যক্ত, কখন তাহার মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস শুনিলে লোক জমিয়া যায়। কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করে, কেহ পরিহাস। কিন্তু পাগলের মনে হয়, তাঁহার চারিদিকে সব ছায়ার পুত্তলি দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার কাছে এখন একমাত্র সত্য—মা, আর সব ছায়া। দেবালয়ের কর্ম্মচারীগণ সব ছায়ার পুতুল। কিন্তু যে মায়ের জন্য পাগল—পাগল, সে মায়ের পূজাও এখন তিনি বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিতে পারেন না। পূজার সময় হয় ত কোন দিন কোথাও নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া জড়বৎ বসিয়া আছেন, নয় ত হৃদয়ভেদী হাহাকারে দিক্ বিদীর্ণ করিতেছেন। যেদিন মাতুলের ভাবান্তর দেখে, হৃদয় ব্রাহ্মণেতর দ্বারা কোনরূপে পূজা সম্পন্ন করাইয়া লয়। ইহা বরং ভাল। কিন্তু মাতুল যেদিন পূজা করিতে মন্দিরে প্রবেশ করেন, সে দিন সমূহ বিপদ। মামা কখন যে কি করিয়া বসেন, কিছুরই ঠিক নাই। হয় ত কোনদিন পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর ন্যায় কলরোল তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন, নয় ত ভোগপাত্র হস্তে সিংহাসনে উঠিয়া মায়ের মুখে অন্নব্যঞ্জন স্পর্শ করাইতে লাগিলেন; কখন বা যেন জগন্মাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভোগ্যবস্তু নিজ মুখে স্পর্শ করিয়া সেই উচ্ছিষ্ট মায়ের মুখে তুলিয়া দিলেন। ছায়ার পুতুল সব দূরে দাঁড়াইয়া দেখে, পরস্পর কানাকানি করে—অনাচারে সব পণ্ড হইল। কিন্তু পাগলকে কোন কথা বলিতে সাহস হয় না,

আর শ্রীমন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতেও ভয় হয়, গা ছম্ ছম্ করে, মনে হয় যেন কি এক অলৌকিক অধিষ্ঠানে দেবী-গৃহ জম্‌জম্ করিতেছে! ছায়ার পুতুল ছায়ার দেশে সরিয়া গিয়া বলাবলি করিতে থাকে—রাণীকে অবিলম্বে সকল কথা জানান কর্ত্তব্য, নহিলে পাগলের আর কি হইবে, আমাদেরই বিপদ ঘটিবে। এক-দিন একটা ক্ষুধিত মার্জ্জার দেবীগৃহে প্রবেশ করিয়া আর্ত্তরব তুলিতেই পাগল 'খাও মা' বলিয়া ভোগের অন্ন-ব্যঞ্জন তাহার মুখে ধরিয়া দিলেন। ইহাতে ছায়ার পুতুলের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। সকলে কমিটী করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে সংবাদ প্রেরণ করিল। হৃদয়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—না জানি কি ঘটে!

কিন্তু ঘটিল যাহা, তাহা হৃদয়ের অতি অসম্ভব প্রত্যাশারও অতীত। মথুর হঠকারী হইলেও সদা সতর্ক, বিশেষ 'বাবা' সম্বন্ধে। তিনি দেবালয়ের কর্ম্মচারীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, শীঘ্রই সরেজমিন্ তদন্তে আসিবেন। ছায়ার পুতুল সব উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

মথুর যেদিন পরিদর্শনে আসিলেন, সেদিন পাগল স্বয়ং পূজকের আসনে অধিষ্ঠিত। মথুর সন্তর্পণে সংযত পদে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে তাঁহার অন্তর দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, কি এক বিরাট্ আবির্ভাবে শ্রীমন্দির পরিপূর্ণ; সংসারের ভোগ-পিপাসা লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে শরীর জড়সড় হয়, মন কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে! ভীত-চকিত নেত্রে মথুর প্রতিমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, প্রস্তর সচেতন হইয়াছে। অপার্থিব আভায় মায়ের মুখ ঝল্‌মল্, করুণায় ত্রিনেত্র টল্‌টল্ করিতেছে।

চারিদিক দেখিয়া মথুরের বিহ্বল দৃষ্টি ক্রমে পূজকের উপর নিশ্চল হইল। দেখিলেন, পাগলের মুখও কি এক অপূর্ব্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল, যেন প্রফুল্ল কমল অরুণ-করে ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে। বরদায়িনী অভয়ার শ্রীচরণ-কমলে কুসুমাঞ্জলি দিতে দিতে পাগল বলিতেছেন, "মাঁ, এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে। এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান, এই নে তোর ধর্ম্ম, এই নে তোর অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে।" সে আকুল উচ্ছ্বাস, গদ্‌গদ ভাষ, ব্যাকুল আত্মসমর্পণ, কাতর প্রার্থনা শুনিতে শুনিতে কাম-কাঞ্চনলিপ্ত, বিষয়াসক্ত মথুরের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। উদ্বেলিত ভক্তিপুলকে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। মথুর দিব্যজ্ঞানে বুঝিলেন যে, সংসার-বুদ্ধিতে সাধারণ মানব যাঁহাকে প্রেতাবিষ্ট বা পাগল বলিয়া ধারণা করিয়াছে, সেই দিব্যোন্মাদ সাধক দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। পাগল বৈ কি! পাগল নয় ত কি! যে লোক পার্থিব ভোগ কাম-কাঞ্চন-বিলাস বিমুখ হইয়া অপার্থিব বস্তুর অন্বেষণ করে, যে পিঞ্জরের পোষা পাখী ছাড়িয়া দিয়া বনের পাখী ধরিতে ছুটিয়া যায়, সে নির্ব্বোধ, পাগল, উন্মাদ। কিন্তু এ পাগলকে ভালবাসিতে সাধ হয় কেন? মনে হয়, ইহাকে মাথায় বুকে কোথায় রাখি! মথুর দেখিলেন, তিনি এতক্ষণ আসিয়াছেন, পাগলের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছেন, পাগল তাহা একবারও লক্ষ্য করিলেন না, যেন তাঁহার মা ও তিনি ছাড়া মন্দিরে আর কেহই নাই। মথুরের মুখ দিয়া কোন কথা নিঃসৃত হইল না, যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলেন,

তেমনি নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রভুর গম্ভীর মুখচ্ছবি দেখিয়া ছায়ার পুত্তলিদের মধ্যে কেহই তাঁহার আদেশ গ্রহণের নিমিত্ত সন্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ছায়ার পুতুলদের চোখ কথা কয়। এক জোড়া চোখ আর এক জোড়াকে বলিল, যাও না হে, কি হুকুম জেনেই এস না! এত ভয়টা কিসের? আদিষ্ট চোখজোড়া বলিল, আজ্ঞে, নাঃ, ভয় কি, আপনিই যান না। প্রথম জোড়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাতাপত্রের উপর নত হইয়া পড়িল। এদিকে মথুর বৈঠকখানা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিলেন না, মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। ভয়ে ভাবনায় হৃদয় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

জামাতাকে তদন্তে পাঠাইয়া রাণী উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন! পাগলের সরল শিশুর মত ব্যবহার, মাতৃনামে মাতোয়ারা তাহার আত্মহারা গান—কৈ, এ সকলে ত উন্মাদের লক্ষণ কিছুই নাই। তবে কর্ম্মচারীরা কি বলে? পাগলের প্রতি কি অপরিসীম বাৎসল্য রাণীর হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিল! না জানি, মথুর ফিরিয়া আসিয়া কি সংবাদই দেয়! অনতিবিলম্বে মথুর ফিরিয়া আসিয়া, আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিবেদন করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়াছে।" রাণীর উদ্বেলিত ভক্তি দুই বিন্দু অশ্রুতে ঝরিয়া পড়িল।

এদিকে ছায়ার পুতুলসব রাণীর আদেশ-অপেক্ষায় নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। মথুর যে একপ্রকার বিরক্ত হইয়াই ওরূপ-ভাবে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া সকলে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল। এখন কেবল হুকুম আসার অপেক্ষা। তাহা হইলেই

আপদঃ শান্তি। নিরীহ পাগল কাহারও কোন অনিষ্ট না করিলেও প্রোজ্জ্বল বহ্নিশিখার ন্যায় তাহার তেজস্বিনী মূর্ত্তি, অকারণে উত্তেজিত ভাব এবং নিঃশঙ্ক যথেচ্ছাচার দেখিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সকলে জড়সড় হইয়া থাকিত। তাহাকে কোন কথা বলা ত দূরের কথা, সকলসময় সহসা তাহার সম্মুখীন হইতেও সাহসে কুলাইত না। কিন্তু এইবার সকল উপদ্রবের শেষ হইবে ভাবিয়া মনে মনে সকলে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এখন আদেশ আসিলে হয়! আদেশ আসিল, তাহাদের আশার সম্পূর্ণ বিপরীত—ভট্টাচার্য্যমহাশয় যে ভাবে ইচ্ছা পূজা করুণ, খুব সাবধান, কেহ তাঁহাকে বাধা প্রদান বা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করে! আদেশ পড়িয়া প্রধান পুতুলের চক্ষু এবার কপালে উঠিল। সকলে উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল?" প্রধান পক্ষ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল—"কি হল? খুব হ'ল! উনি যা ইচ্ছে করুন, আমাদের কথায় কাজ নাই! একটা গুরুতর কাণ্ড না হ'লে বড়লোকের চৈতন্য হবে না!" চক্ষুসকল পরস্পর চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল।

গুরুতর কাণ্ড ঘটিতেও বেশী বিলম্ব হইল না। সেদিন রাণী স্বয়ং দেবালয়ে আসিয়াছেন। শ্রীভবতারিণীর পূজা শেষ হইয়া-গিয়াছে। রাসমণি গঙ্গাস্নান সমাপন করিয়া মন্দিরে আসিলেন এবং পূজার্থিনী হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সন্নিকটে আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ফুল বিল্বদল বাছিতে বাছিতে ছোটভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন—গীত গাহিতে। রাণীর ভক্তিপ্রবণ চিত্ত পাগলের গানে যেমন একনিষ্ঠ হইত এমন আর কিছুতেই নহে। কিন্তু আজ

সম্পূর্ণ বিপরীত। আদালতে সেই সময় একটা গুরুতর মোকদ্দমা চলিতেছিল, রাসমণি তাহারই ফলাফল চিন্তায় অন্যমনস্ক। এদিকে পাগলের গান হঠাৎ থামিয়া গেল। শ্রোত্রীর অঙ্গে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া পাগল রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এখানেও ঐ ভাবনা, ঐ চিন্তা!" সঙ্গের পরিচারিকারা তার স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সতর্ক প্রহরীদল ছুটিয়া আসিল এবং দেখিতে দেখিতে কর্ম্মচারীবর্গও আসিয়া জুটিল। প্রধান পুতুল তখন অপ্রধানগণের দিকে ফিরিয়া এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, যাহার অর্থ— কেমন! বলেছিলুম!

কিন্তু যাঁহাদের লইয়া এই হৈ চৈ গণ্ডগোল, তাঁহারা উভয়েই নির্ব্বাক্, গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট বাহিরের গোলমালে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। পাগলের অধরে ঈষৎ হাস্যরেখা, আর যেন অন্যায় আচরণে ধরা পড়িয়া রাসমণি অপ্রতিভ, বিচারকের সমক্ষে নত-নয়না। দিব্যদৃষ্টিশালিনী, মহা মনস্বিনী রাণী অন্তশ্চক্ষু দ্বারা আপনার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখিয়া বুঝিলেন, অপরাধ সম্পূর্ণ তাঁহার; কিন্তু এই পাগল তাহা জানিল কিরূপে? এ কি অন্তর্য্যামী? ভাবিলেন, এ পাগল যে-ই হক, দৈবপ্রেরণায় যে তাঁহার দণ্ডবিধান করিয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই। পাপহর পূত হস্তের দণ্ড, রাণী করুণার দান জ্ঞানে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। রাসমণি ভক্তিভরে দণ্ডদাতাকে অভিবাদন করিয়া উঠিলেন। মন্দিরের বাহিরে তাঁহার লোকজন তখনও গোলমাল করিতেছিল। রাণীর রোষকষায়িত নেত্র দেখিয়া সকলে সরিয়া পড়িল।

পাঁচজনের মুখে পাঁচরকম বিবরণ শুনিয়া মথুর স্বয়ং শ্বশ্রুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উদার-হৃদয় রাণী তাঁহার কাছে ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "ছোটভটচাযের কোন দোষ নেই, বাবা! দেখো, তাঁর ওপর কেউ কিছু না অত্যাচার করে!"

মথুর সমস্ত শুনিলেন, দৈবপ্রেরণাও বুঝিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে হইল, দিব্যোন্মাদ অবস্থা হইলেও ইহা উন্মত্ততা ত বটে। এই সেদিন বরাহনগরের ঘাটে এমনি একটা ঘটনা ঘটিয়াছে। জয়মুখুয্যে জপ করিতেছিল অন্যমনস্ক হইয়া, পাগল তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছেন। মথুর বুদ্ধিমান ও তেজস্বী, ভাল-মন্দ উভয় অবস্থাই ঠিক ঠিক গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার কাছে আপোষ নিষ্পত্তি রফা ছিল না। নামে কি আসে যায়? কার্য্যই আপনার পরিচয় আপনি প্রদান করে। বাবার এই যে বিসদৃশ আচরণ, ইহা বায়ুরোগের পূর্ব্বলক্ষণ। এখনি ইহার প্রতিকার না করিলে কালে যে কোথায় ইহার গতি-পরিণতি হইবে, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। বাবা ত বালক, আপনার ভাল-মন্দ বুঝেন না। আমরাই এখন ওঁর অভিভাবক। ইহাঁর চিকিৎসা কর্ত্তব্য। হৃদয় ইতিপূর্ব্বেই সে ব্যবস্থা করিয়াছিল, মথুরের কথায় সাগ্রহে অনুমোদন করিল। সে সময়ের প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের হাতে মথুর বাবার চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু রোগ আপনার গোঁভরে চলিল। মত্ত হস্তীর ন্যায় কোন বাধাই মানিল না।

মথুর দেখিলেন, বাবার দ্বারা আর পূজার কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহার দিনরাত্রি জ্ঞান নাই, পূজার কালাকালের জ্ঞান থাকা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। হৃদয় অথবা হৃদুর উপর বিষ্ণু-ঘরের ভার রহিয়াছে। তাহাকে দেবী পূজার ভার অর্পণ করিলে বাবার সেবাসুশ্রূষার ত্রুটি হইবে। সে ভার কাহাকে অর্পণ করা যায়? প্রশ্নের সমাধান আপনা আপনি হইয়া গেল। গদাধরের খুড়তুত ভাই রামতারক ওরফে হলধারী সেই সময় কর্ম্মান্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তিনিই কালীঘরের পূজক নিযুক্ত হইলেন।

হলধারী সুপণ্ডিত ছিলেন এবং আচার-ধর্ম্মের উপর তাঁহার সুগভীর নিষ্ঠা ছিল। ঠাকুরবাড়ী হইতে সিধা লইয়া তিনি স্বপাক আহার করিতেন। প্রথম যখন তিনি এই প্রার্থনা করেন, তখন মথুর বলিয়াছিলেন, 'আপনার ভাই, ভাগিনা ত দেবীর প্রসাদ খান।' হলধারী তাহাতে উত্তর দেন, "আমার ভাইয়ের কথা স্বতন্ত্র। তার যেরূপ উচ্চাবস্থা, তাতে ওসব দোষের হয় না। আমি তা করতে পারি না।'

কিন্তু গদাধরের এই উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে হলধারী দুইদণ্ড কাল একমত স্থির রাখিতে পারিতেন না। ভ্রাতাকে বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে দেখিলে তিনি হৃদয়কে বলিতেন, "হৃদু ও কাপড় ফেলে দেয়, পৈতা ফেলে দেয়, এমন কি ওর উচ্চাবস্থা হয়েছে! তুই জোর করে পরাতে পারিস নি?"

আবার ভগবৎপ্রসঙ্গে তাহার অলৌকিক উল্লাস, আকুল অশ্রুধারা, দেবীর দর্শনলাভের নিমিত্ত উদ্দাম ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া ভাবিতেন, ভগবানের আবেশ ভিন্ন কখন এরূপ সম্ভবপর

হয় না। হৃদয়কে বলিতেন, তুই নিশ্চয় ওর ভিতর কিছু দেখেছিস, নৈলে এত করে সেবা করতে পারিস? শ্রীমন্দিরে পাগলের অলোকসামান্য ভাবাবেশ, ভক্তির উচ্ছ্বাস, জগন্মাতার সহিত মাতা ও সন্তানের ন্যায় একাত্মভাবে ব্যবহার দেখিয়া হলধারী কখন কখন বলিয়া ফেলিতেন, 'ওরে আমি তোকে চিনেছি।' পাগল যদি পরিহাস করিয়া বলিতেন 'দেখো, আবার যেন গোল করে বোসনা।' হলধারী তাহাতে উত্তর দিতেন, 'নাঃ, আর কি ফাঁকি দিতে পারিস। কিন্তু নস্যের ফাঁকি নাকে গুঁজিতে গুঁজিতে বিচারে বসিলেই যে ফাঁকি, সেই ফাঁকি!

নস্যগ্রহণ এবং শাস্ত্রবিচার হলধারীর প্রানাপেক্ষা প্রিয় ছিল। একদিন তিনি অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচার করিতেছিলেন, গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যা সব বল্‌ছ, মায়ের কৃপায় আমার সব উপলব্ধি হয়েছে। আমি তোমার সব কথা বেশ বুঝতে পারছি।" হলধারী ক্ষণেক ভায়ার মুখ চাহিয়া বলিলেন—"হুঁঃ! (নস্য গ্রহণ)—গণ্ডমূর্খ কোথাকার!—(নস্য)—তুই আবার এ সব বুঝিস, হাঁঃ!"—(খুব বড় এক টিপ্)—গদাধর হাসিয়া বলিলেন, 'দাদা, এই না সেদিন বল্‌লে, আমার সম্বন্ধে আর মত বদ্‌লাবে না!"—"যা যাঃ—(পুনঃ পুনঃ টিপ্)—মূর্খ কোথাকার!" পাগল হাসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এই সময় পাগল এক অদ্ভুত সাধনায় রত হইলেন। শাস্ত্র বলিয়াছে, জগন্মাতার অবাধ কৃপা লাভ করিতে হইলে বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান—'সমলোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ'—দীনের দীন, হীনের হীন হইতে হইবে, ত্যাগ-বৈরাগ্যই সাধনার প্রথম সোপান। কিন্তু ত্যাগ

কেবল মনে মনে করিলেই সম্পূর্ণ হয় না। কায়-মন উভয়ে ত্যাগ করিতে হয়। পাগল কায়মনে কাঞ্চন ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে এক হস্তে টাকা এবং অপর হস্তে মৃৎখণ্ড লইয়া 'টাকা—মাটি', 'মাটি—টাকা' বলিতে বলিতে মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর ধারণা সুদৃঢ় হইলে টাকা ও মাটি দু-ই জলে ফেলিয়া দিলেন। ছায়ার পুতুল সব হাসিয়া অস্থির হইল। টাকাটা জলে ফেলে দিলে হে! ফেলে দিলে ত আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিলে না কেন? অবোধ ছায়ার পুতুল বুঝে না যে, টাকার সঙ্গে সঙ্গে ঢেলাও লইতে হইত।

দীনতা ও নিরহঙ্কার সাধনের জন্য পাগল সাধারণের অস্পৃশ্য অপবিত্র স্থান ধৌত করিতেন। কাঙ্গালীদিগের উচ্ছিষ্ট পাত মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতেন, পরে সম্মার্জ্জনী লইয়া দেবালয়ের প্রাঙ্গন ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতঃপর সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান সম্পাদনের জন্য পাগল যেদিন কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন এবং তাহা মহাপ্রসাদ জ্ঞানে মস্তকে ধারণ করিলেন, সেদিন হলধারীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি পাগলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই করলি কি! কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি? তোর ছেলে-মেয়ের বে কেমন করে হয়, দেখ্‌ব।" এ কথায় অপরিসীম ধৈর্য্যশালী পাগলেরও ধৈর্য্যচুতি হইল। পাগল বলিলেন, "তবে রে—! তুই না গীতা পড়িস, বেদান্ত পড়িস? শাস্ত্র বিচার করিস—জগৎ মিথ্যা, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? তোর মতন বল্‌ব জগৎ মিথ্যা, আবার ছেলে-মেয়েও হবে। তোর শাস্ত্রপাঠের কপালে আগুন!"

উত্তর শুনিয়া হলধারী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। দেবীমন্দিরে কিছুদিন পূজা করিবার পর তিনি নানা কারণে মথুরমোহনকে অনুরোধ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর পূজারী নিযুক্ত হইলেন। হৃদয়কে দেবীমন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হইল। কথিত আছে, হলধারী বৈষ্ণবতন্ত্র মতে পরকীয়া-রস সাধন করিতেন। দেবালয়ের কর্ম্মচারীগণ একথা জানিতে পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসিৎ আলোচনা করিত। কিন্তু হলধারীর ক্রোধে পড়িবার ভয়ে কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। ভ্রাতার সম্বন্ধে এইরূপ জল্পনা আলোচনা শুনিয়া নির্ভীক পাগল হলধারীকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। হলধারী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গদাধরকে অভিশাপ দিলেন, "তুই কনিষ্ঠ হ'য়ে আমাকে এমন সব কথা বলিস! তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্বে!" গদাধর তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে দেবালয়ের অতিথিশালায় আগত এক জন হঠযোগীর নিকট গদাধর হঠযোগ অভ্যাস করিতে-ছিলেন। হলধারী শাপ দিবার কিছু দিন পরে হঠাৎ সন্ধ্যার পর এক রাত্রে গদাধরের তালুদেশ হইতে রক্ত-মোক্ষণ হইতে থাকে —গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ শোণিত। পাগল ত কাঁদিয়াই অস্থির। হলধারীকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "দাদা গো, তোমার শাপে আমার এই হ'ল!" নিরুপায় হলধারীও ক্ষোভে মনস্তাপে ভ্রাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নারীসুলভ রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ দিন অতিথি-

শালায় একজন অভিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। তিনি গদাধরকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ তোমার ভালই হয়েছে। তুমি হঠযোগ করতে, তার ফলে তোমার শরীরের রক্ত মাথায় উঠ্‌ছিল! ঐ রক্ত মাথায় উঠ্‌লে তুমি জড়ের মত অচেতন হয়ে থাক্‌তে, ঐ জড়-সমাধি আর কিছুতেই ভাঙ্‌তো না। জগন্মাতা তোমায় রক্ষা করেছেন।'

এইরূপে মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রায় চারি বৎসর অতীত হইতে চলিল। কিন্তু গদাধরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। কদাচ কখন স্থির থাকেন; নহিলে সেই আকুল অশ্রুধার, হৃদিভেদী হাহাকার, মাটীতে লুটাইয়া ক্রন্দন, বালিতে মুখ ঘষা। ঔষধ, পথ্য, সেবার ত্রুটি নাই, তথাপি রোগের উপশম হয় না। হৃদয় ইতিপূর্ব্বেই কামারপুকুরে পত্র লিখিয়াছে। সেখানে চন্দ্রাদেবী যেমন ব্যাকুল, এখানে রাণী ও মথুর তেমনি শঙ্কাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অনুমান করিলেন, ব্রহ্মচর্য্য খণ্ডিত না হইলে বায়ুরোগ সারিবে না। হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মথুর এক পরমাসুন্দরী নারী আনিয়া গদাধরের ঘরে বসাইয়া রাখিলেন। পাগল তখন অন্যত্র ছিলেন, কক্ষে আসিয়াই রমণীকে দেখিয়া পরমোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "হৃদু, হৃদু, দেখ্‌বি আয়, কে এসেছে!" হৃদয় আসিলে পাগল অশ্রুধারে ভাসিয়া রমণীকে প্রণাম করিয়া জোড়করে, করুণ স্বরে বলিলেন, "মা, মা, যদি কৃপা করে এসেছিল, তোর দীনহীন সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন জগন্মাতা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।"

(৯)

কথা কাণে হাঁটে। গদাধরের অদ্ভুত আচরণসকল জনমুখে নানারূপ ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুর তোলপাড় করিতে লাগিল। কেহ বলিল—বায়ুরোগ, কেহ বলিল—প্রেতাবেশ। চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। হৃদয় যথাসম্ভব আশ্বাস দিয়া পত্র লিখিলেও সময় সময় তাহার কলমের মুখ দিয়া এমন দু'একটা কথা বাহির হইয়া পড়ে যে, মাতা ও ভ্রাতার উৎকণ্ঠা শতগুণ বাড়িয়া উঠে।

দাম্পত্যের নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করিয়া পতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। জননীর শোকজীর্ণ হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া রাম-কুমার পিতার অনুগমন করিয়াছেন। মাতৃহৃদয়ের মর্ম্মন্তুদ বেদনা কেবল রঘুবীরই জানেন! রামেশ্বরের চির উদাসীন ভাব! সংসার ত একপ্রকার ভাঙ্গিয়াই গিয়াছে। তথাপি এ ভাঙ্গাহাটে গদাইকে লইয়া নূতন করিয়া দোকানপাট পাতিবার জন্য বৃদ্ধা বিধবা নিরাশায় আশা বাঁধিয়া কতই না কল্পনা জল্পনা করিয়াছিলেন! গদাধরের বিবাহ দিবেন। গৃহে নববধূ আসিবে। স্নেহের উদ্বেলিত ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইবেন। বধূ তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া 'মা-মা' বলিয়া সাথে সাথে ফিরিবে। গৃহকর্ম্ম, সেবাধর্ম্ম শিখিবে। সময়ে সুশিক্ষিতা বধূকে সংসার সমর্পণ করিয়া, রঘুবীরের উপর সকলের ভার দিয়া বৃদ্ধা পতির উদ্দেশে মহাযাত্রা করিবেন। কল্পনার পটে চন্দ্রাদেবী এমনি কত সোণার ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু নিয়তি—তাঁহার চিরবৈরী নিয়তি

—সহসা সে সোণার কল্পনার উপর কালী ঢালিয়া দিল ! গদাধরের সর্ব্বদা চঞ্চল ভাব, দেহে দুঃসহ তাপ, 'মা-মা' বলিয়া তাহার অহর্নিশ ক্রন্দনের কথা শুনিয়া মাতৃহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর মর্ম্মস্থলে নিরন্তর সূচিবিদ্ধ হইতে লাগিল। আহা, বাছাকে কাছে আনিয়া স্নেহবিগলিত সুশীতল অশ্রুধারায় সিক্ত করিলে কি তাহার অসহ অঙ্গতাপ জুড়াইবে না ! বৃদ্ধার বাস্পাকুলিত, অশ্রুসিক্ত চক্ষু চঞ্চল হইয়া চারিভিতে গদাইকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

কিন্তু গদাধরের কামারপুকুর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাবে রামেশ্বর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রাণী স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিয়া সুচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতেছেন। মথুরমোহন অতি সতর্কতার সহিত ঔষধ-পথ্যের তদ্বির করিতেছেন। তারপর তাঁহারা ধনীলোক। চোখের অন্তরাল হইলে মনের অন্তরাল হইতে কতক্ষণ ? আর এই ক্ষুদ্র পল্লীতে চিকিৎসার ব্যবস্থাই বা কি হইবে ? এখানে চিকিৎসক নাই, ঔষধ নাই। এখানে চিকিৎসক স্বয়ং প্রকৃতি। ঔষধ—মুক্ত আকাশ। পথ্য—বিশুদ্ধ বাতাস। হয় ত এই শ্যাম শষ্পময়, হরিৎসমাচ্ছন্ন স্বাস্থ্যমন্দিরে আমার গদাধর নিরাময় হইতে পারে। সত্যই ত ! এই তাহার জন্মভূমি—দুঃখে সমবেদনাময়ী, সুখে ভোগদাত্রী ; সঙ্কটে ত্রাণকর্ত্রী, রোগে নিরাময়-বিধাত্রী ; আপদে অভয়া, বিপদে বিজয়া। এখানকার অমৃতরস তার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত ; ইহার পুণ্যস্মৃতি তার অস্থিমজ্জায় সঞ্চিত। ঐ সেই মাণিক রাজার আমবাগান, যেখানে সে মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় অবাধ আনন্দে গান করিয়া বেড়াইত। এমন প্রভাত কোথাও হয় না ; এমন

বাতাস কোথাও বয় না! কোথায় এমন ফুল ফুটে, এমন চাঁদ উঠে? কোন দেশে নীলাকাশে এমন মেঘ ভেসে যায়! কোন বনে এমন পাখী গায়! তার উপর তার আরামের জন্য বাহিরে জন্মদা মেদিনীর বিস্তৃত শ্যামাঞ্চল, ঘরে অপার করুণাময়ী জননীর স্নেহকোল! এখানকার অপেক্ষা আর কোথায় সে অধিক সুখে থাকিবে? এখানে আসিলে, বনবিহার করিলে, পাখীর গান শুনিলে, মুক্ত বাতাসের আস্বাদ পাইলে, প্রকৃতির শিশু পূর্ব্বপ্রকৃতি ফিরিয়া পাইবে। গদাধরকে কামারপুকুরে ফিরাইয়া আনা হইল।

কিন্তু দূরে বরং ছিল ভাল, পুত্রের অবস্থা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া চন্দ্রাদেবী আরও কাতর হইয়া উঠিলেন। মাতা দেখিলেন, কি এক অলৌকিক আবেগ যেন তাঁহার অঞ্চলের নিধিকে নিয়ত চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। একি অসহ্য তাপ তাহার দেহে! কাছে যাইলে যেন মনে হয়, ভস্ম করিয়া ফেলিবে! তার উপর সময় সময় 'মা-মা' বলিয়া একি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ! চন্দ্রাদেবী ছুটিয়া আসেন, কত সান্ত্বনা দেন, কিন্তু তাঁহার স্নেহমাখা বাক্য, গদাধরের মর্ম্মস্পর্শ করা দূরে থাক, কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। তাহার পূর্ব্বসহচরগণ সর্ব্বদা কাছে আসিতে এখন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। মনে হয়, ইহার মন, প্রাণ, আত্মা যেন আর এক লোকে বিচরণ করিতেছে, কেবল মাটীর দেহটা এই মাটীর পৃথিবীর অধিবাসী হইয়া আছে। গভীর রাত্রে গদাধর কোথায় চলিয়া যায়! রামেশ্বর অনুসন্ধানে জানিলেন যে, ভ্রাতা কখন ভূতির খাল, কখন বুধুই মোড়লের শ্মশানে সাধনা করে।

দিন বহিতে লাগিল। কিন্তু দিনে দিনে গদাধরের সে উদ্দাম, উন্মনা ভাব ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল। চন্দ্রাদেবী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন। রামেশ্বরের মুখে হাস্যরেখা দেখা দিল এবং মাতাপুত্রে নয়নে নয়নে ইঙ্গিত-বিনিময় হইল—আর বিলম্ব কেন? এইবার পাত্রী নির্ব্বাচন কর। মহা উৎসাহে রামেশ্বর পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোপনে, কেন না গদাই জানিতে পারিলে পাছে সব ভণ্ডুল করিয়া দেয়! উহাকে ত জানা আছে, যা ধরিবে তাই! উপনয়নের সময় কি কাণ্ডই না করিয়াছিল! কুলপ্রথা, গোষ্ঠিবর্গের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সব উপেক্ষা করিয়া ধনীকামারিনীকে ভিক্ষামাতা করিল! এ ক্ষেত্রে যদি কোন গোল বাধাইয়া বসে! সব ঠিকঠাক করিয়া শিশুপ্রকৃতি বালককে ভুলাইয়া একবার ভালয় ভালয় বিবাহটা হইয়া গেলে হয়! কিন্তু মাতা ভ্রাতা বিস্মিত নেত্রে দেখিলেন, বিবাহের কথায় গদাধর কোন বাধা প্রদান করিল না, বরং চপলস্বভাব বালকের ন্যায় রঙ্গরস করিতে লাগিল। রামেশ্বর নিশ্চিন্ত হইয়া পাত্রী খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে এক গোল বাধিল। ও-দেশের প্রথানুসারে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় এবং কন্যার বয়সানুসারে পণের অর্থ নিরুপিত হইয়া থাকে। পাত্রের যোগ্যা পাত্রী আনিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, এ নিঃস্ব পরিবারের তাহা সাধ্যাতীত। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর জয়রামবাটী নিবাসী শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইল। শুভ বিবাহক্রিয়া সম্পাদনার্থ রামেশ্বর ভ্রাতাকে লইয়া শুভযাত্রা করিলেন।

নির্ব্বিঘ্নে কন্যাসম্প্রদান কার্য্য শেষ হইয়া গেল। কিন্তু বাসরে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরেই বর সুসজ্জিতা রমণীমণ্ডলীকে দেখিয়া সহসা দিব্যভাবাবেশে গান করিতে আরম্ভ করিল। কোথায় রহিল বাসরের রঙ্গরস আর নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত কলহাস! স্তব্ধশ্বাস বামাদল মন্ত্রমুগ্ধা ফণিনীর ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া সে অশ্রুসিক্ত আকুল কণ্ঠস্বর, উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে লাগিল। গদাধর সম্পর্ক নির্ব্বিশেষে মাতৃসম্বোধনে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রমোদের বাসর দিব্যানন্দের উচ্ছ্বাসে টলমল করিতে লাগিল।

পরদি[illegible]রামেশ্বর ভ্রাতৃবধূকে স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া বাটী লইয়া[illegible] গহনাগুলি চন্দ্রাদেবী এই উদ্দেশ্যে গ্রাম্য জমিদা[illegible]বাবুদের বাটী হইতে চাহিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু যখন সেগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধার অশ্রুজল আর মানা মানিল না। আহা, এমন সুলক্ষণা সোণার বউ! ইহার অঙ্গ হইতে কি আভরণ খুলিয়া লওয়া যায়! কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্য! বধূকে অঙ্কে লইয়া চন্দ্রাদেবী বারবার অলঙ্কার মোচনের চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁহার প্রসারিত কর অবশ হইয়া ফিরিয়া আসে। বিধবার শোকদগ্ধ হৃদয়ে যে নিঃশব্দে এই দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা বাটীর কেহই লক্ষ্য করেন নাই। বোধ করি তাহার সাক্ষী ছিলেন, অন্তরীক্ষে বিধাতা; আর একজন, যিনি মাতার এই রমণীসুলভ আচরণ দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন, তিনি গদাধর। অবশেষে

তিনিই জননীকে এই উভয়সঙ্কট হইতে রক্ষা করিলেন। অতি সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে ঘুমন্ত বালিকার দেহ হইতে গহণাগুলি খুলিয়া লইয়া তিনি মাতার হস্তে দিলেন। কিন্তু বালিকা হইলেও বুদ্ধিমতী বধূ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া শ্বশ্রুকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'মা আমার গায়ের গ'না কই?' শ্বশ্রু প্রাণপ্রতিমা বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "মা, গদাই তোমাকে এরপর এরচেয়েও কত ভাল ভাল গয়না দিবেন।" কিছুক্ষণ পরে বালিকা সকল কথাই ভুলিয়া গেল। কিন্তু তাহার পিতৃব্য আসিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইলেন। একে প্রাণসমা বধূকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তার উপর নূতন কুটুম্বের বাক্যবান! আবার ব্যাপারটাকে আরও গুরুতর রূপে পরিণত করিয়া পিতৃব্য ঐ দিনেই কন্যাকে তাহার পিত্রালয়ে স্থানান্তরিত করিলেন। ইহাতে শরের উপর শেলাঘাত [illegible] গদাধর মাতাকে নিরতিশয় কাতর দেখিয়া বলিলেন, "মা, ওরা এখন যা-ই বলুক, যা-ই করুক, বে ত আর ফিরবেক নি।" পুত্রের কথায় চন্দ্রাদেবীর অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল সহসা হাস্যরেখায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

বিবাহের পর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত গদাধর মাতার অনুরোধে প্রায় এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরে অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সংসারের দুরন্ত অভাব অনটন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আর কালবিলম্ব করিতে না পারিয়া দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনরায় দেবকার্য্যে ব্রতী হইলেন। হৃদয় নিশ্চিন্ত চিত্তে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল।

কিন্তু এ সুবাতাস অধিক দিন বহিল না। কিছু দিন ভবতারিণীর সেবা করিতে করিতে আবার তাঁহার পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সেই আকুল ক্রন্দন, অনুক্ষণ উন্মনা ভাব, সেই সাংসারিক প্রসঙ্গে বিষম বিরাগ। আবার সেই গাত্রদাহ, অনিদ্রা; অধিকন্তু চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গেল। মথুর তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা পুনরায় চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোনই ফলোদয় হইল না। হৃদয় মাতুলকে মধ্যে মধ্যে কবিরাজের কুমারটুলীর ভবনে লইয়া যাইতেন। একদিন উভয়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অপর একজন চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ইনি গদাধরকে সম্যক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ইঁহার শারীরিক বিকার এবং লক্ষণাদি দেখিয়া অনুমান হয় যে, রোগীর দেবোন্মাদ অবস্থা। ঔষধে ইহার প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়।

এই সময় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয় সম্বন্ধে এক আকস্মিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। রাণী রাসমণি সহসা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা হইলেন। রাণী একদিন পদস্খলিত হইয়া পতিত হন্। এই দুর্ঘটনা হইতেই জ্বর এবং অতিসার রোগের সূত্রপাত হয়। কিছু দিন চিকিৎসা করাইয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী রাণী বুঝিলেন, ইহা পীড়া নহে, মৃত্যুর আহ্বান।

অন্তিম সময় সন্নিকট বুঝিয়া রাসমণি আর কালবিলম্ব করিলেন না; সংসার-রঙ্গভূমি, ভোগপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ ভবনে স্থানান্তরিত হইলেন। এই পুণ্যক্ষেত্রে

পুণ্যবতী রাণীর অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইল। গদাধরের বয়স এখন চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ। এই সময় হইতেই তাঁহার শাস্ত্র-বিহিত সাধনার আরম্ভ।

(১০)

এখন হইতে আমরা গদাধরকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'কোন কোন গাছে আগে ফল ধরে, পরে ফুল হয়—যেমন লাউ কুমড়া।' অর্থাৎ কোন কোন ভাগ্যবান্ সাধক প্রবল অনুরাগবলে অগ্রে ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিয়া পরে শাস্ত্রবিহিত সাধনায় ব্রতী হইয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ জীবনে এই সত্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

এই লোকোত্তর পুরুষপ্রবর যখন শাস্ত্রবিহিত সাধনায় ব্রতী হয়েন, তখন যৌবনের পূর্ণ আবির্ভাবে তাঁহার দেহ সতেজ, সবল, রমণীয় মাধুর্য্যময়। অঙ্গের স্বাভাবিক গৌরকান্তি আরও স্ফুটতর হইয়াছে এবং তাহার প্রতি ভঙ্গিমায় পরুষশ্রী প্রতীয়মান্। বাল্যের সে নবনীত-কমনীয় বিনোদ সৌন্দর্য্য চিরতিরোহিত হইয়া সুবঙ্কিম চক্ষুদ্বয়ে তাহার সুমধুর সারল্য চিরাঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। সে প্রফুল্ল, স্বচ্ছ অন্তর-দর্পণে দৃষ্টিপাত করিয়া কে বলিবে যে, কুটিল সংসার তাহার উপর ছায়াপাত করিয়াছে! সে চক্ষু যে দেখিত সেই আকর্ষিত হইত।

রাণী রাসমণির পরলোক প্রাপ্তির পর মথুর এখন শ্বশ্রুর বিষয়-বৈভবের সর্ব্বময় কর্ত্তা। 'বাবা'র উপর তাঁহার একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাভক্তি দিন দিন দৃঢ়তর হইতে লাগিল। কিন্তু সংশয়-নিশ্চয়ে কত ঘাত-প্রতিঘাত যে, এই দৃঢ় নিষ্ঠার পশ্চাৎ লুক্কায়িত তাহা সহজেই অনুমেয়। একে সংশয়-জননী পাশ্চাত্য শিক্ষায় মথুরের মন বিকৃত, তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত, দুর্ব্বোধ আচরণ! মথুরের বিষয়াসক্ত চিত্ত কখন বলে, 'পাগল, পাগল, এ নিশ্চয় পাগল, আর যে এর তত্ত্বে ফেরে সেও চূড়ান্ত পাগল!' কিন্তু তখনই আবার সেই পাগলের মুখে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শুনিয়া মথুর ভাবে বিভোর হইয়া ভাবেন, কে বলে ইনি পাগল! ইনি ত মহা জ্ঞানী! পুনশ্চ মহাবীর-ভাব সাধনায় তাঁহার উগ্র ভাব, লম্ফ ঝম্ফ দেখিয়া বিকট হুঙ্কার শুনিয়া মথুরের মনে হয়, নাঃ, ইঁহাকে বুঝাও গেল না, ইঁহার ভাবেরও অন্ত পাওয়া গেল না। আর আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন? কিন্তু মথুর এই মধুর পাগলকে অন্তর হইতে যতই দূরে রাখিবার চেষ্টা করেন, পাগল ততই তাঁহার বুক জুড়িয়া বসে। কে যেন চুম্বকের অলক্ষ্য আকর্ষণে তাঁহাকে পাগলের কাছে টানিয়া আনে!

বাবাকে সময় সময় মহা জ্ঞানী মনে হইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত মথুর তাঁহার সহিত তর্ক-বিচারে কখন বিরত হইতেন না। এক দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর কিছুরই অধীন নহেন। মথুর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'সে কি, বাবা! তিনিও নিয়মে বদ্ধ। জগৎ যে নিয়মে চলছে, তিনি যা আইন করে দিয়েছেন, সে আইনে তিনিও বাঁধা পড়েছেন, তার আর ব্যতিক্রম করতে পারেন না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'সে কি কথা! যিনি আইনের কর্ত্তা, তিনি রদ্, বাহাল্, বদল্, সবই করতে পারেন।'

মথুর উত্তর দিলেন, 'না, বাবা! তিনি যে আইন একবার বাহাল্ করেছেন, তা আর রদ্-বদল্ করতে তাঁরও সাধ্য নাই। লাল ফুলের গাছে কি সাদা ফুল ফুটে? তা যদি ফুটে তা হলে মানি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'তাঁর ইচ্ছায় তাও হ'তে পারে। তাঁর ইচ্ছা হ'লে লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও ফুটে।'

প্রত্যক্ষ নহিলে একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মথুর বাজে তর্ক করিবার লোক ছিলেন না। আর কিছু না বলিয়া নীরব হইলেন।

পরদিন প্রাতে উদ্যানপথে আসিতে আসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন. একটা জবাগাছের শাখায় পাশাপাশি দুটী ফুল ফুটিয়াছে —তার একটী সাদা, একটী লাল। শ্রীরামকৃষ্ণ ডালটী ভাঙ্গিয়া আনিয়া মথুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, 'এই দেখ, মথুর!'

মথুর ডালটী হাতে তুলিয়া লইলেন। তারপর উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ চাহিয়া বলিলেন, 'আমারই ভুল হয়েছিল, বাবা!'

এইরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে নানা দিক হইতে নানা ভাবে লক্ষ্য করিতে করিতে মথুরের ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল যে, এই দিব্যোন্মাদ পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরেও একটা অলৌকিক শৃঙ্খলা আছে। তারপর দৈবাৎ একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে ইষ্টমূর্ত্তির বিকাশ দেখিয়া আর দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করিয়া মথুর পাগলের পায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর পুনরায় দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ আর নিত্য নিয়মিতরূপে পূজা করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রতিদিন স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া শ্রীভবতারিণীকে সুসজ্জিত করিতেন। এইরূপ ফুল তুলিতে তুলিতে একদিন দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তীরবেগে আসিয়া বাগানের উত্তরাংশে অবস্থিত বকুলতলার ঘাটে লাগিল এবং এক গৈরিকবসনা রমণী তাহা হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রধান ঘাটের চাঁদ্‌নী অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

রমণী কোনদিক লক্ষ্য না করিয়া ধীর মন্থর গমনে আসিয়া প্রধান ঘাটের চাঁদনীর উপর বসিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কক্ষে গমন করিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে বলিলেন, 'চাঁদনীতে একজন ভৈরবী বসে আছে, তাকে ডেকে আন্‌তে পারিস ?'

নারী-সাহচর্য্য যিনি কালসর্পের ন্যায় দূরে পরিহার করেন, তাঁহার মুখে ঈদৃশ আদেশ শুনিয়া হৃদয় বিস্মিত হইল। তারপর বলিল, 'চেনাশোনা নেই, ডাক্‌লে আসবে কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, 'তুই আমার কথা বলে ডাকগে যা না, আসবে এখন।'

হৃদয় জানিত, মাতুল যাহা ধরিবেন, তাহা সম্পন্ন না হইলে স্বস্তি বা নিষ্কৃতি নাই। অগত্যা সন্ন্যাসিনীর নিকট চলিল।

চাঁদ্‌নীতে আসিয়া দেখিল, এ কি অপরূপ! গৈরিকে আবৃত রমণীর চাম্পেয় গৌরকান্তি যেন বহ্নির অন্তরালে স্বর্ণের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে! মুখে কি দিব্য-দীপ্তি! পবন-চঞ্চল, দীর্ঘ আলু-লায়িত রূক্ষ কুন্তল-কোলে অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় প্রশস্ত ললাটফলকে স্থূল

সিন্দুর-বিন্দু যেন অরুণরাগে জ্বলিতেছে! চক্ষুতে প্রখর জ্যোতি এবং তাহার নিস্তব্ধ প্রভাব মধ্যাহ্ন তেজের ন্যায় দুঃসহ! রমণী প্রৌঢ় বয়স্কা, কিন্তু পরিত্যক্ত যৌবন এখনও যেন সে বর বপু প্রত্যাখ্যান করিয়া যাইতে পারিতেছে না—বরং নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় অধিকতর প্রোজ্জ্বল। সন্ন্যাসিনীর পবিত্র রূপলাবণ্য দেখিলে মনে হয় যেন মদনমোহন-সহচরী ও স্মরহর-কিঙ্করী একাধারে বিরাজমানা! ভৈরবীর সঙ্গে একটী ছোট পুঁটুলী ছিল, তিনি যত্নে তাহার গ্রন্থি খুলিতে লাগিলেন। হৃদয় দেখিল, কতকগুলি পুস্তক রহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে ভৈরবীর সমীপস্থ হইয়া বন্দনা করিয়া বলিল, 'আমার মামা এখানে আছেন, ঈশ্বরীয় কথায় তাঁর ভাব হয়। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?'

ভৈরবী তৎক্ষণাৎ উঠিলেন এবং হৃদয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়াই ভৈরবীর প্রশান্ত বদনে আনন্দ ও বিস্ময়ের ছবি প্রকটিত হইয়া উঠিল। তাঁহার প্রখর চক্ষুদ্বয় সহসা যেন স্নেহবিগলিত হইয়া স্নিগ্ধভাব ধারণ করিল তিনি বাষ্পাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, গঙ্গাতীরে দেশ-দেশান্তরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তুমি এখানে রয়েছ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা আমাকে তুমি জান্‌লে কেমন করে?'

'মায়ের কৃপায় জেনেছি, বাবা!' বলিয়া ভৈরবী উপবিষ্ট হইলেন।

স্নেহময়ী মাতার নিকট বালক যেমন অকপটে আত্মকাহিনী

ব্যক্ত করে, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 'আমার গা অহরহঃ জ্বলে যাচ্ছে! দু-তিন ঘণ্টা ধরে গঙ্গার জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকি, তাতেও ঠাণ্ডা হয় না। দিন রাত্রি ঘুম নাই। এই দেখ, চোখের পলক পড়ে না। আর কত কি যে দেখি! পঞ্চবটীতে নারীমূর্ত্তি দেখেছিলাম। তার রূপ যেন ধরে না, কিন্তু যেন মন-দুঃখে তার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। প্রথমে চিন্‌তে পারিনি। অবাক্ হয়ে চেয়েছিলাম। চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দেখি, একটা হনুমান কোথা থেকে লাফিয়ে এসে তাঁর পায় লুটিয়ে পড়্‌ল। তখন বুঝতে পারলাম, ইনি সীতা। সে সময় আমি মহাবীরের ভাব ধরে প্রকাণ্ড লাঠি ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়াতাম। মায়ের প্রসঙ্গ হলে বাহ্যজ্ঞান থাকে না। মা, এ আমার কি হল? চৈতন্যময়ীকে ডেকে কি আমি পাগল হলাম! শুনিতে শুনিতে ভৈরবী রোমাঞ্চিত কলেবরা—কখন হসিতাধরা, কখন গলশ্রুধারিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ যতই ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ গা, মাকে মনে প্রাণে ডেকে আমি কি শেষে পাগল হলাম! মাতৃহৃদয়া সন্ন্যাসিনী করুণার্দ্রকণ্ঠে ততই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, 'বাবা, তুমি পাগল হয়েছ বটে, কিন্তু এমনি পাগল হয়েছিলেন, ব্রজের রাধারাণী; এমনি পাগল হয়েছিলেন, নদের শ্রীগৌরাঙ্গ! আর কায়-মন-বাক্যে যে ঠিক ঠিক শ্রীভগবান্‌কে ডাকে, সে-ই এমনি পাগল হয়! এর নাম মহাভাব! প্রেমময় ঈশ্বরের অসহ্য বিরহে তাঁদেরও গা পুড়্‌ত। এ জ্বালা কি গঙ্গাজলে গা ডুবুলে যায়, বাবা! আমার কাছে ভক্তিশাস্ত্রের পুঁথি আছে! তাতে এ জ্বালার ঔষধও লেখা আছে। আমি

সব তোমায় দেখিয়ে দেব। আর তোমার গা-জ্বালার ঔষধের ব্যবস্থা করব। বৈদ্যের ঔষধে এ ব্যাধি আরাম হবে না।'

হৃদয় ত অবাক্! মাতুল ভৈরবীর সহিত ব্যবহার করিতেছেন, যেন চিরপরিচিতা পরমাত্মীয়া! ক্রমে তাঁহার মুখে শাস্ত্র-প্রসঙ্গ শুনিয়া হৃদয় বুঝিল, সন্ন্যাসিনী যেমন অসামান্যা রূপসী, তেমনি অদ্বিতীয়া বিদুষী। কে এ রমণী? কোন্ ভাগ্যবতী জননী ইঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাকে বধূরূপে বরণ করিয়াই বা কোন্ কুল ধন্য হইয়াছিল? কোন্ নিভৃত অন্তঃপুর হইতে ইনি লোকলোচন পথে আবির্ভূত হইয়াছেন? সেখানকারই বা কি ইতিহাস? এই মোহিনীমূর্ত্তির অন্তরালে কি নিবিড় রহস্য নিহিত! কিন্তু হৃদয়ের তীব্র কৌতূহল সে রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইল না। কেবল জানিতে পারিল যে, ভৈরবী জাতিতে ব্রাহ্মণী ছিলেন এবং তাঁহার নাম যোগেশ্বরী।

কিন্তু প্রথম দর্শনে মথুর সন্ন্যাসিনীকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখিলেন না। একে ইঁহার অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্য, তার উপর স্বেচ্ছাচারিণী, বিদুষী হইলে কি হয়? চরিত্রবল স্বতন্ত্র পদার্থ, মথুর তাহা জানিতেন। বিশেষতঃ সংশয় মথুরের ন্যায় বিষয়ী লোকের স্বভাবসিদ্ধ। তবে 'বাবা' শতমুখে ভৈরবীর প্রশংসা করেন। তা বালক-স্বভাব 'বাবা' ত আশুতোষ ভোলানাথ! তাঁর উদার দৃষ্টি বিন্দুকে সিন্ধু দেখে। 'বাবার' কাছে হয় ত ইঁহার অসীম শাস্ত্রজ্ঞান আর গেরুয়ারই সমাদর। কিন্তু কে বলিতে পারে ঐ গেরুয়ার আবরণে কত কি ঢাকা আছে?

একদিন সন্ন্যাসিনী শ্রীভবতারিণীর মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, দ্বারদেশে মথুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভাণ বা লুকোচুরিতে সরল-স্বভাব মথুরের বিষম বিতৃষ্ণা ছিল। তিনি জানিতেন, ইন্দ্রিয়-জয় দুঃসাধ্য। পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যদি কেহ কাদা মাখে, সে ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু সে কাদা যে চন্দন মাখিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করে, তাহার ছলনা অমার্জ্জনীয়। গেরুয়ার জাল দলিল জারি করিয়া যে সম্ভ্রমের মহল দখল করিবার প্রয়াস পায়, সে ত জুয়াচোর। আজ আত্মাসতীর মন্দির-দ্বারে সহসা সেই গৈরিক-বসনাকে দেখিয়া মথুর আর মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না। প্রচ্ছন্ন হাস্যে তাঁহার অধরপ্রান্ত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসিনীর প্রশান্ত মুখের উপর তাঁহার আয়ত লোচনের উদ্ধত দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মথুর বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন, "ভৈরবি, তোমার ভৈরব কৈ?' কিন্তু বাণ ব্যর্থ হইয়া মথুরকেই বিদ্ধ করিল। তিনি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভৈরবীর গম্ভীর বদনে ক্রোধ বা লজ্জার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই। চম্পককলিকা সদৃশ অঙ্গুলিনির্দ্দেশে শ্যামাপদাশ্রিত, সহস্রদলশায়িত মহেশ্বরকে দেখাইয়া স্নিগ্ধ অবিচলিত কণ্ঠে গৈরিকধারিণী উত্তর দিলেন—'ঐ!' অপ্রত্যাশিত উত্তরে মথুর বিস্মিত স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তিনিও আজ সংশয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে চান্। ঈষৎ হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, 'ও ত জড়।' ভৈরবী দৃঢ়, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'জড়কে চেতাইয়া তুলিবার শক্তি যদি না ধরি, তবে ভৈরবীর বেশ ধরিয়াছি কেন?' মথুরের মুখে আর

বাক্য সরিল না। মনে মনে সন্ন্যাসিনীকে প্রণাম করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে অবস্থিতিকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও আচরণসকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিয়া ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, বেদ যাঁহাদিগকে 'আধিকারীক পুরুষ' আখ্যা দিয়াছেন, ইনি সেই শ্রেণীর! ইঁহার দুঃসহ অঙ্গদাহও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় ঈশ্বর-বিরহজনিত। ভক্তিগ্রন্থ সমূহে এরূপ জ্বালার যে প্রতিকার নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার প্রয়োগেই এ দাহ প্রশমিত হইবে। একদিন সন্ন্যাসিনী কর্ত্তৃক রাশি রাশি চন্দন-প্রলেপ ও পুষ্পসম্ভারে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত হইলে তাঁহার দুঃসহ জ্বালা জুড়াইয়া গেল। ভৈরবী মুক্তকণ্ঠে নিজ ধারণা সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গদাহ দূর হইল। কিন্তু তাঁহার সহিত পুনঃপুনঃ কথোপকথনে ভৈরবী-ব্রাহ্মণী বুঝিলেন যে, সাধনলব্ধ অনুভূতি নহে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ অলৌকিক প্রত্যক্ষসকলে আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। সন্ন্যাসিনীর উত্তেজনায় শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রবিহিত সাধনায় ব্রতী হইলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে প্রথম তন্ত্রপথ অবলম্বন করিলেন।

দেবালয়ে পাঁচ ছয় দিন বাস করিবার পর ভৈরবী তৎসন্নিহিত দেবীমণ্ডলের ঘাটে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। এখান হইতে নিত্য আসিয়া তিনি পুত্রপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধনায় সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণী পূর্ব্ববঙ্গে অপর দুইজন সাধককে অনুরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই

অদ্ভুত সাধকের ক্ষিপ্রতায় তাঁহার আর আশ্চর্য্যের অবধি রহিল না। দৃঢ় অধ্যবসায় ও সংযম সহকারে যে পথ অতিক্রম করিতে অন্য সাধকের প্রাণপাত হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা তিন দিনে লঙ্ঘন করেন। সিদ্ধি যেন ইঁহার করতলগত। এইরূপে চতুঃষষ্ঠি পরিমিত প্রধান তন্ত্রসমূহে সুকর দুষ্কর যত প্রকার সাধন বিধিবদ্ধ আছে, তৎসমুদয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইল।

শাস্ত্রে যাহাকে অষ্টসিদ্ধি বলে, তন্ত্র-সাধনার শেষে সেই অণিমাদি বিভূতিনিচয় শ্রীরামকৃষ্ণকে আশ্রয় করিল। কিন্তু তিনি জীবনে কখন সে সকল অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ করেন নাই। তিনি বলিতেন, এই সকল সিদ্ধি ঈশ্বরলাভের সহায় নহে, বরং অন্তরায়। অলৌকিক শক্তির বিকাশে সাধক চমৎকৃত, উদ্‌ভ্রান্ত এবং ঈশ্বর-বিমুখ হয়। সাধনার পথে এমন কত-শত মণিরত্ন ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। যে সাধক সে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন না, এবং অভিমানও ভোগবাসনার আবির্ভাবে কোন কোন সাধকের পতনও হয়। কোন স্থানে এক সিদ্ধ যোগী বাস করিতেন। নিত্য বহু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করিত। একদিন এক বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি শুনেছি সিদ্ধ-পুরুষ?' যোগী প্রসন্ন হাস্যে উত্তর দিলেন—'হাঁ'। সেই সময় স্থানীয় জমীদারের হাতীকে স্নান করাইয়া মাহুত ফিল্‌খানায় লইয়া যাইতেছিল। বৃদ্ধ যোগীকে বলিলেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে ঐ হাতীটাকে মেরে

ফেলতে পারেন?' যোগী পুনরায় কৃপাহাস্য করিয়া বলিলেন, 'হাঁ; দেখোগে?' বলিয়া বৃদ্ধের উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই হাতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'মরো।' হাতী তৎক্ষণাৎ মরিল। বৃদ্ধ বলিলেন, 'বাঃ! তাজ্জব্! আপনি অদ্ভুত যোগী! ঈশ্বরতুল্য শক্তিশালী। আচ্ছা, ওটাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে পারেন?' যোগী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'হাঁ! ও-বি হোনে স্যাক্তা!' বলিয়া হাতীকে আদেশ করিলেন—'বাঁচো!' হাতী অমনি ধড়্মড়্ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ আর বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া প্রশংসাভিলাষী যোগী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেঁউ? কেয়া দেখা?' বৃদ্ধের মুখ আরও গম্ভীর হইল। তিনি কঠোরকণ্ঠে বলিলেন, 'দেখ্লাম, হাতী মোলো, হাতী বাঁচলো, কিন্তু তোমার কি হ'ল? বৃদ্ধের তিরস্কারে যোগীর চৈতন্য হইল। তিনি সেই মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিয়া তপস্যায় গমন করিলেন।

পাছে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু, ঈশ্বরকামী সাধক অষ্টসিদ্ধির মোহিনীতে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় কথায় গল্পচ্ছলে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেন। বলিতেন, এক ধনীর মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র বিষয় প্রাপ্ত হইল। জ্যেষ্ঠের ধর্ম্মপ্রকৃতি। সে কনিষ্ঠকে বলিল, 'ভাই আমি বিষয় চাই না। গৃহত্যাগ করে সাধন ভজন করব।' গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য কনিষ্ঠ তাহাকে বিস্তর বুঝাইল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ কোন কথা শুনিল না। আপনার অংশ কনিষ্ঠকে দান করিয়া গৃহত্যাগ করিল। দ্বাদশ বৎসরান্তে একবার জন্মভূমি

দেখিতে হয়। জ্যেষ্ঠ দেশে আসিল। তখন তাহার শিরে জটা, তপে শরীর শীর্ণ। তথাপি কনিষ্ঠের তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। আদর, আপ্যায়ন, আহারাদির পর বিশ্রামকালে সে তাহাকে বিরলে প্রশ্ন করিল, 'দাদা, তপস্থায় কিছু পেলে?' জ্যেষ্ঠ গম্ভীর হইয়া বলিল, 'হাঁ, ভাই, পেয়েছি।' কনিষ্ঠ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি পেলে, দাদা?' জ্যেষ্ঠ উত্তর দিল, 'শোনার চেয়ে দেখা ভাল। নদীতীরে চল, দেখ্‌বে।' কনিষ্ঠ দেখিল, জ্যেষ্ঠ হাঁটিয়া নদী পার হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। কনিষ্ঠ তখন বিস্ময়ে জ্যেষ্ঠের মুখ চাহিয়া বলিল, 'দাদা এখানে যে খেয়ার নৌকা বয়, সে আধ পয়সায় পারাপার করে। এই আধ পয়সার লাভের জন্য বনে যাওয়া আর এত কঠোর পরিশ্রম করা'— জ্যেষ্ঠ আপনার ভ্রান্তি বুঝিয়া ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় বাহির হইয়া গেল।

তন্ত্র-সাধনার সময় হৃদয় বিস্মিত নেত্রে দেখিতে লাগিল যে, তপ, জপ, হোম ও নানা কৃচ্ছ্র সাধন সত্ত্বেও মাতুলের অঙ্গকান্তি যেন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কি দিব্য জ্যোতি! প্রজ্বলিত হোমানল যেন অনির্ব্বাণ হইয়া তাঁহার শরীরে আশ্রয়লাভ করিয়াছে! হৃদয়ের মনে হইল যেন সূর্য্যকান্তমণির ন্যায় ইঁহার তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি নিবিড় অন্ধকারকেও আলোকিত করিবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাহুতে সে সময় একখানি স্বর্ণকবচ ছিল, বর্ণে বর্ণে তাহা এমন মিশাইয়া থাকিত যে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব আর লক্ষিত হইত না। সে অলৌকিক লাবণ্য লোকলোচন হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদা একখানি মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেন

আর নিরন্তর কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন—মা, এ বাহ্য রূপ নিয়ে আমাকে অন্তরের রূপ দে !

(১১)

দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়-সংশ্লিষ্ট অতিথিশালার খ্যাতি সাধু-পরিব্রাজক-সঙ্ঘে অতি অল্পকাল মধ্যেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। সাগর-সঙ্গম এবং জগন্নাথ-যাত্রী সাধুগণ পথে এই রমণীয় আশ্রয় পাইয়া তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া যাইতেন। সে জন্য রাণীর পুণ্যকীর্ত্তি-স্থলে সময় সময় শাক্ত, শৈব, রামাৎ, বৈষ্ণব, উগ্র, ধীর, জ্ঞানী, ভক্ত প্রভৃতি কত প্রকৃতির কত ভাবের সাধু-সন্ন্যাসীর যে সমাগম হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। একে গঙ্গাকূলবর্ত্তী মনোরম স্থান ; প্রচুর বায়ু, প্রচুর বারী, সুপ্রচুর ভিক্ষা সহজসুলভ ; তার উপর সাধুদিগের 'দিশাজঙ্গল' অর্থাৎ শৌচাদি আচরণের উপযোগী জনবিরল স্থলের অভাব নাই। এরূপ স্থান যে পরিব্রাজকগণের মনোজ্ঞ আরাম ভূমি হইবে, আশ্চর্য্য কি ?

হৃদয় দেখিল, একদিন এক সাধু আসিয়া উপস্থিত, তাহাকে দেখিলে ভয় হয়। দীর্ঘাকার ; মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, তাতে মুখ ঢাকা পড়েছে। তার ভিতর থেকে, অন্ধকারে যেমন এঞ্জিনের আলো জ্বলে, তেমনি দুটো চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে ! যেমন চুল, তেমনি লম্বা লম্বা নখ। তাকে দেখলে পিশাচ বলে মনে হয়। সেই মড়াখেকো চেহারা আবার একখানা ছেঁড়া মড়ার কাঁথায় আগাগোড়া ঢাকা। পায় ছেঁড়া জুতা। এক

হাতে একটা কঞ্চি, আর এক হাতে একটা ভাঙ্গা ভাঁড়, তাতে একটা আম্‌চারা। দেবালয়ে এসেই গঙ্গায় একটা ডুব দিলে। তারপর না করলে সন্ধ্যা, না করলে আহ্নিক, কোঁচড়ে কি ছিল, তাই খেতে লেগে গেল! যখন ক্ষুধা শান্তি হল, তখন মায়ের মন্দিরে গিয়ে একটা স্তব পড়লে, মনে হল যেন নবরত্নের চূড়াগুল দুল্‌ছে! তখন কাঙ্গালীদের প্রসাদ পাবার সময় হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে তাদের সঙ্গে বস্‌তে গেল, কিন্তু তারা পাগল বলে তাকে বস্‌তে দিলে না। সে ফিক্ ফিক্ করে হাস্‌তে হাস্‌তে সরে দাঁড়াল। তারপর কাঙ্গালীদের খাওয়া হলে যেখানে সকড়ী-পাত ফেলা হয়, সেইখানে বসে তাদের এঁটো ভাত একটা কুকুরের সঙ্গে এক পাতে খেতে আরম্ভ করলে। কুকুরটা যেন তার চিরকালের পোষা; তার মুখের কাছ থেকে ভাত নিয়ে খেতে লাগল, তবু সেটা কিছু বল্‌লে না।' এই ত সাধু। কিন্তু হৃদয় দেখিল, এই নির্ঘৃণ্য উন্মাদকে তাহার মাতুল অত্যন্ত মনোযোগসহকারে লক্ষ্য করিতেছেন। বলিল, 'মামা, তুমি ঐ পাগলটাকে অমন করে কি দেখছ?' মাতুল বলিলেন, 'পাগল নয় রে, ও জ্ঞানোন্মাদ।' তারপর হৃদয়ের গলাধরে তীব্র কাতর স্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হৃদুরে, মা কি আমাকেও অমনি দশা করে পথে পথে ফেরাবে?' কিন্তু এ কথার উত্তর দিয়া মাতুলকে সান্ত্বনা করিবার মত সময় হৃদুর তখন ছিল না। কেন না জ্ঞানোন্মাদ তখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যাইতেছে। হৃদয় কোন কথা না বলিয়া পাগলের পশ্চাৎ ছুটিল এবং অবিলম্বে তাহার সন্নিহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মহারাজ, ভগবান্‌কে

লাভ করবার উপায় বলে দিন।' পাগল একবার ফিরিয়া চাহিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না। যেমন গোঁভরে চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। হৃদয়ও ছাড়িবার পাত্র নয়, চলিতে চলিতে বলিতে লাগিল, 'মহারাজ, কৃপা করুন।' পুনঃ পুনঃ পৃষ্ট হইয়া পাগল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'কি আর বল্‌ব, এই যে নর্দ্দমা দেখছিস্, যখন এর জল আর ঐ গঙ্গার জল এক মনে হবে, তখন পাবি'—বলিয়া পাগল আর তিলমাত্র দাঁড়াইল না, হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিছু দূর গিয়া দুই একবার পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিল, হৃদয় তখনও সঙ্গ ছাড়ে নাই। উন্মাদের চক্ষু সহসা জ্বলিয়া উঠিল! পথে পতিত একখণ্ড ইষ্টক তুলিয়া হৃদয়কে তাড়া করিল! হৃদয় পলাইতে পথ পাইল না।

আর একদিন আর এক সাধু আসিয়াছিল, তাহার মুখখানি যেন হাসির ক্ষেত্র এবং চোখদুটী দিয়া আনন্দের জ্যোতি যেন ফুটিয়া বাহির হইত। সে বেশী বাক্যালাপ করিত না, দিবারাত্রি মগ্নমনে বসিয়া থাকিত। কেবল সকাল-সন্ধ্যা এক একবার বাহির হইয়া বহিঃপ্রকৃতির শোভা দেখিত আর পুলকে নৃত্য করিতে করিতে বলিত, 'বাঃ বাঃ, কেয়সা প্রপঞ্চ্ বানায়া, কেয়া মায়া!'

আবার এক সাধু আসিল, তাহার সঙ্গে এক প্রকাণ্ড পুঁথি। শিখ্ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ-সাহেবের মত সেই পুঁথি তাহার পরম আরাধ্য বস্তু ছিল। সে সেখানিকে নিত্য পুষ্প চন্দন দিয়া সুসজ্জিত করিত এবং দিনের মধ্যে যে কতবার তাহাকে খুলিয়া দেখিয়া তুলিয়া রাখিত, তাহার ঠিক ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,

ঐ পুঁথিখানি বেদ-বেদান্ত বা জ্ঞান-ভক্তি বৈরাগ্যের পথপ্রদর্শক অন্য কোন গ্রন্থ, দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ কৌতূহল জন্মে এবং বিস্তর সাধ্য-সাধনার পর সাধু একদিন তাঁহাকে তাহা দেখিতে দেয়। কিন্তু মণি-মাণিক্য দেখিতে দিয়া অনিষ্টাশঙ্কায় লোক যেমন ভয়ে ভয়ে থাকে, গ্রন্থখানি যতক্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে ছিল, সাধু তেমনি শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! গ্রন্থখানিতে আর কিছুই নাই, কেবল লালকালীতে বড় বড় অক্ষরে হাতে লেখা রাম নাম! শ্রীরামকৃষ্ণের বিস্মিত ভাব দেখিয়া সাধু বলিল, 'বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র, যা কিছু আছে, তাঁর এক নামে সবই আছে। তাই তাঁর নাম নিয়ে আছি।'

সে সময় দক্ষিণেশ্বরে যে সকল রামপন্থী সাধক আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সিদ্ধসাধু জটাধারীর বিবরণ অতীব বিস্ময়কর। অসীম, অগাধ, অলৌকিক প্রেম-ভক্তিবলে ইষ্টদেবতার ভাবঘন মূর্ত্তি যাঁহাদিগের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, মহা ভাগ্যবান্ জটাধারী সেই সাধকগণের অন্যতম। শ্রীভগবানের উপর ঐকান্তিক অনন্য অনুরাগ ব্যতীত তাঁহার দর্শনলাভ অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "মায়ের সন্তানের উপর, সতীর পতির উপর, বিষয়ীর বিষয়ের উপর যেমন টান, এই তিন টান এক না হলে ভগবান্ লাভ হয় না।' ঈশ্বরানুগ্রহে যখন কোন সুকৃতিসম্পন্ন সাধকের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয় তখন দেবতা আর দেবতা থাকেন না। দেবত্বের সকল ঐশ্বর্য্য পরিহার করিয়া আপনার হইতে আপনার হইয়া ভক্তের লীলা-বিলাস-লালসা চরিতার্থ করেন। রামায়েৎ সাধু

জটাধারীর অশেষ সুকৃতিফলে এরূপ ভাগ্যোদয় হইয়াছিল। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের বালমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। অষ্টধাতু-নির্ম্মিত একটী বিগ্রহ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। সাধু আদরে তাহাকে 'রামলালা' বলিয়া ডাকিতেন।

রামলালার প্রতি এই সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর প্রগাঢ় বাৎসল্যের কথা ভাবিলে হৃদয় পুলকিত, বিগলিত হয়। হৃদয় দেখিল, জটাধারী জপ তপ সাধন ভজন কিছুই করেন না, রামলালাকে লইয়া দিবারাত্রি তন্ময় হইয়া আছেন। শ্রীশ্রীভবতারিণীর মঙ্গলারতি সুসম্পন্ন হইয়া গেল। আকাশে ঊষারাগ তখনও অস্পষ্ট। মায়ের দেউলচূড়ে তারকার দীপ হীনজ্যোতি হইলেও এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। আরতির শঙ্খ-ঘণ্টারোল তখনও যেন দুলিয়া দুলিয়া জাহ্নবীজলে খেলিয়া বেড়াইতেছে। পাখীকুল কুলায়ে বসিয়া জড়িত স্বরে মায়ের প্রভাতী বন্দনা গাহিতেছে। কিন্তু বাগানের বৃক্ষবল্লী এখনও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন —মন্দ পবনে মন্দ মন্দ ঢুলিতেছে। সংসারের অধিকার লইয়া স্বপ্ন ও জাগরণে এখনও যেন দ্বন্দ্ব চলিতেছে। কিন্তু ভক্তি-রাজ্যের অধিবাসী চিরসজাগ জটাধারী আনন্দে গদগদ হইয়া করতালিসহকারে ভজন গাহিতেছেন, আর কার যেন নটনচঞ্চল সুমধুর নূপুরধ্বনি প্রভাত-পবনে ভাসিয়া আসিতেছে! সাধু রামলালাকে বাল্যভোগ দিতেছেন—দুইখানি বাতাসা! ইষ্টদেবতার প্রতি বাবাজীর অকপট আন্তরিক বাৎসল্যভাব দেখিলে হৃদয় পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু বাবাজীর সকল আচরণ যদি উন্মত্ততা না হয়, তাহা হইলে কি দুরন্ত

ছেলে এই রামলালা! এই বৃদ্ধ সাধুকে একদণ্ড সুস্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে দেয় না, সর্ব্বদাই সন্তর্পণে থাকিতে হয়, পাছে কখন কি করিয়া বসে! এই বেশ ভালমানুষটীর মত বসিয়া আছে, হঠাৎ তীরবেগে ছুটীল—কাঁটাবনে ফুল তুলিতে! অমনি সাধু চীৎকার করিয়া উঠেন—'ওরে, যাস্‌নি, যাস্‌নি, তোর ফুলের মত গা, কাঁটায় ছড়ে যাবে। ফিরে আয়! আয় বলছি! ছি বাবা, বাবুদের বাগান, ফুল ছিঁড়লে ডাল ভাঙলে বক্‌বে, মার্‌বে, দুষ্টুমি কর্‌তে আছে!' সে কি তা শুনে! সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গণ্ডগোল হয়, তাহার আহার-কালে। সে ফেলাফেলি, ছড়াছড়ি, প্রফুল্ল পদ্ম-কোরকসদৃশ ওষ্ঠপুট ফুলাইয়া এটা-ওটা-সেটার জন্য বায়না, যত প্রকার অন্যায়, অসঙ্গত আব্‌দার জটাধারীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। শান্তস্বভাব সাধু অশান্ত বালককে কখন ভুলান্—'আজ এই খাও, বাপ, কাল তোমাকে লাড্ডু এনে দেব।' কখন তিরস্কার করেন—'না খেলি ত আমার কি! তোরই পেট জ্বলবে! ওরে খা, নইলে পিত্তি পড়ে অসুখ করবে। খা! খা বল্‌ছি!' বলিয়াই বাবাজী বিগ্রহের মুখে আহার তুলিয়া দেন। বিগ্রহ খায় না এবং কস্মিন্‌কালে যে সেই অষ্টধাতু-মূর্ত্তির ভোজনে রুচি হইবে সে সম্ভাবনাও কোন লোকের মনে উদিত হয় না। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিতে থাকেন, 'তোর জন্যে যে জ্বালাতন হলাম। আমার জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, সব গেল! তোকে নিয়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে বেরিয়েছি। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এনে তোকে খাওয়াই। আমার কি আছে যে তোর নিত্যনূতন বায়না আমি যোগাব?'

বাবাজীর চক্ষু দিয়া জল ঝরিতে থাকে। যে দেখে সে ভাবে, এ কি উন্মত্ত প্রলাপ! কিন্তু বেশী দিনের কথা নয়, এমনি পাগল ত আর একজনও হইয়াছিলেন। নিজের উচ্ছিষ্ট অন্ন শ্রীভবতারিণীর মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। পাথরের ঠাকুর বলিয়া কেহ উপহাস করিলে প্রতিমার নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখাইয়াছেন, এই দেখ, মা প্রাণময়ী, নিশ্বাসে তুলা নড়িতেছে! শ্রীরাম-কৃষ্ণের ন্যায় এ প্রবীন সাধুও কি তেমনি উন্মাদ হইয়াছে? উন্মাদ নয় ত কি? জড়ে চৈতন্যভ্রম উন্মাদেরই সম্ভব। তবে সাধন-ভজনের পরিণাম কি এই মস্তিষ্ক-বিকার? হায়, বিধাতার এই বিনোদ সংসার—সর্ব্বভোগের আগার, আনন্দের এই পরিপূর্ণ আয়োজন সব ব্যর্থ করে, সুখের আশ, কাম-কাঞ্চন-বিলাস বিসর্জ্জন দিয়ে হৃদয়হীন দেবতার প্রসন্নতার জন্য অনিদ্রায় অনাহারে অকাতর প্রাণপাত; ইষ্টের আকাজ্ক্ষায় অনুদ্দিষ্টের উদ্দেশে এই অনিশ্চিত প্রয়াস, কি কেবল অলীক স্বপ্নরাজ্যে অভিযান? ইহার অপেক্ষা করুণ আত্মপ্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি হইতে পারে? কিন্তু সাধকের এইরূপ অবস্থা যে মস্তিষ্কের বিকার, তাহাই বা কেমন করিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করা যায়? বিদুষী ভৈরবী-ব্রাহ্মণী যখন মথুরমোহন কর্ত্তৃক আহূত বিশিষ্ট পণ্ডিত-সভায় শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদোক্ত আধিকারিক পুরুষ বলিয়া প্রচার করেন এবং তাঁহার বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও আচরণ প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈষ্ণব-প্রধান বৈষ্ণবচরণ ও তান্ত্রিক-শ্রেষ্ঠ গৌরী পণ্ডিত তাঁহাকে নর-দেবতা জ্ঞানে স্তবস্তুতি-বন্দনায় প্রসন্ন করিতে প্রয়াস পান, সে সময় এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণকুমারের মুখে ঈশ্বর-

প্রসঙ্গ, জ্ঞানালোচনা শুনিয়া সভাস্থ পণ্ডিতসকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এ কি পাগলের দ্বারা সম্ভব? কখনই না। কিন্তু যদি শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্ব কার্য্যকলাপ, জটাধারীর বর্ত্তমান আচরণ-সকল সত্য হয়, তবে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ দেবতাদ্বয়কে সকলে দেখিতে পায় না কেন? শাস্ত্র বলেন, সে চিন্ময় ভাবঘন মূর্ত্তি চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। কোথায় এমন চক্ষু যাহাতে অপ্রত্যক্ষের ছায়াপাত হয়?

স্থূলবুদ্ধি হৃদয়ের দৃষ্টি সাধারণতঃ স্থূল হইলেও তাহার পরম স্নেহের পাত্র মাতুল সম্বন্ধে অতীব প্রখর। হৃদয় লক্ষ্য করিয়াছে, জটাধারীর আগমনাবধি মাতুল তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চান না। ইহার সংসর্গে না জানি আবার কি হিড়িক উঠে! এই ত সেদিন বীরভক্ত 'মহাবীরের' দাস্য-ভাব সাধনায় কি কাণ্ড না ঘটিয়া গেল! সে প্রকাণ্ড লাঠী ঘাড়ে করে তার স্বরে জয়রাম চীৎকার! বাগানের ভূতগুল ত সব হেসেই লুটোপুটি! মায় আত্মীয়পক্ষ হলধারী পর্য্যন্ত 'ভূতে পেয়েছে' বলে রটনা কর্‌লে। কেলেঙ্কারীর একশেষ! ভাগ্যে মথুরবাবু সহায় আছেন। মামা ত একটা তরঙ্গ পেলে হয়! কিছু দিন থেকে রামনামের ধুয়ো উঠেছে। মামা ভূতগুলকে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। তার উপর কোথা হতে এই পাগ্‌লা সাধু এসে জুটেছে! একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব সহায়।

হৃদয়ের আশঙ্কা অচিরেই ফলবতী হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ জটাধারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যভাব সাধনায় ব্রতী হইলেন। দেবালয়ের ভূতগুল ছোটভট্‌চাযের নূতন খেয়ালে

নূতন রকমের আমোদ বোধ করিয়া বাছা বাছা বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

এদিকে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া গেল। রামলালা আর জটাধারীর কাছে থাকিতে চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যতক্ষণ সাধুর নিকট উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ সে বেশ শান্ত হইয়া খেলাধূলা করে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি উঠিবার উপক্রম করেন, রামলালা অমনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বসনাগ্র ধরে। বাবাজীর ম্লান মুখ, সজল চক্ষু দেখিয়া লজ্জা-সঙ্কোচে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ আপনি থামিয়া যায়। তাঁহার মনে হয় যেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্ব্বস্বধন, একমাত্র অবলম্বন তিনি কাড়িয়া লইয়া যাইতেছেন। এ এক উভয়সঙ্কট! রামলালাকে ফেলিয়া আসিতে মন সরে না, আবার বাবাজীকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে লইয়া আসাও দায়! রামলালাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া ব্যথিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ কক্ষের বাহিরে আসেন। কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পশ্চাতে চঞ্চল রুণুঝুণু রোল তাঁহার উৎকর্ণ শ্রবণকে চকিত করিয়া তুলে। শ্রীরামকৃষ্ণ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন, দুই বাহু বাড়াইয়া রামলালা তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ইহাকে নিবারণ করে কাহার সাধ্য! উচ্ছ্বসিত আবেগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে বক্ষে আবদ্ধ করেন। কিন্তু বস্ত্রে বায়ু বাঁধিয়া রাখা বরং সহজ তথাপি এই চঞ্চল শিশুটীকে এক স্থানে আবদ্ধ রাখা সুকঠিন। সে কোলে উঠিয়াই বলে, নামাইয়া দে। নামিয়াই বলে, কোলে কর।

রামলালাকে ঘরে লইয়া গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে পরম যত্নে

স্বহস্তপ্রস্তুত নারিকেল লাড়ু খাইতে দেন। সে অর্দ্ধদষ্ট লাড্ডু হাসিতে হাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দেয়। রামলালাকে অতি যত্নে স্নান করাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার নীলকমল-লাঞ্ছিত অঙ্গ যতনে চন্দনচর্চ্চিত করিয়া দেন। কিন্তু ধূলার প্রতি এই শিশুর কি স্বাভাবিক আকর্ষণ! চক্ষুর পলক না পড়িতে পড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন, তাহার অলকা-তিলকা অর্দ্ধেক মুছিয়া গিয়াছে; নয়নের কজ্জলরাগ দলিত হইয়া নীলোৎপল কপোলের উপর ভ্রমরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কি সুন্দর! ইহার সজ্জিত বেশ যেমন নয়নানন্দকর, শ্রীহীনতাও তেমনি মনোহর। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে পাছে দৌড়াদৌড়ি করে বা গঙ্গায় নেমে ঝাঁপাই ঝোড়ে, সে জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিতেন। বারণ করিলে আরও বাড়ায়। দুষ্ট বালকের দুরন্তপনায় অতিষ্ঠ হইয়া তাড়না করিতে গেলে সে এমনি ভীতি-চকিত কাতর মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখের পানে চায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ আর তাহাকে শাসন করিতে পারেন না।

একদিন গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবার সময় পশ্চাতে নূপুরনিক্কণ শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরিয়া দেখিলেন, রামলালা ছুটিয়া আসিতেছে, সেও স্নান করিতে যাইবে। সেদিন আর কিছুতেই তাহাকে ভুলাইয়া রাখা গেল না। জলে নামিয়া বালক দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। "ঠাণ্ডা লাগবে, সর্দ্দি করবে'—শ্রীরামকৃষ্ণ কত বুঝাইলেন, কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে অসহ্য ক্রোধে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে জলের ভিতর চুবাইয়া ধরিলেন। কিন্তু জলের ভিতর সে এমনি আটুপাটু করিয়া হাঁপাইতে লাগিল যে, ভয়ে অনুতাপে

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং ক্লিষ্ট শিশুকে কম্পিত বক্ষে তুলিয়া লইয়া গঙ্গার জলে যত না সে সিক্ত হইয়াছিল, অশ্রুনীরে তাহাকে তদধিক অভিষিক্ত করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আর একদিন রামলালা বড় বায়না করছিল। তাকে ভোলাবার জন্যে দুটি খৈ খেতে দিয়েছিলেম। ঐ খৈয়ে যে ধান ছিল, অত আমি দেখিনি। কিন্তু খেতে খেতে ঐ ধানে তার জিভ চিরে গেল। তার যাতনা দেখে তখন আর কেঁদে বাঁচিনি। কেবলই মনে হতে লাগল, হায় হায়, কি করলেম! এই কচি মুখে মা কৌশল্যা ক্ষীর সর ননী কত সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আর আমি এমনি পাষণ্ড যে, সেই মুখে ধান সুদ্ধ খৈ দিলেম!' দীর্ঘকাল পরেও যখনি একথা শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণে উদয় হইত, তিনি তখন কাঁদিয়া অধীর হইতেন আর দুই চক্ষুর ধারে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত!

বাবাজীর কাছে রামলালা এখন অল্পক্ষণমাত্রই অবস্থান করে। সাধু ব্যাকুল হইয়া কত কি বলেন। কিন্তু রামলালা তাহার পদ্ম-পলাশ-লাঞ্ছিত আয়ত চক্ষুদুটী তাঁহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া ফিক্‌ফিক্ করিয়া হাসে! যেন বাবাজীর অভিযোগে সে নীরবে প্রতিবাদ করে যে, তুমিই ত আমাকে বিলাইয়া দিয়াছ। একদিন রামলালার নিমিত্ত ভোগরন্ধন করিয়া সাধু বহুক্ষণ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। বৃক্ষপত্র নড়ে আর সাধু চকিত হইয়া উঠেন, ঐ বুঝি সে আসিতেছে। কিন্তু হায়, কোথায় কে! জটাধারী অবশেষে ব্যথিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, রামলালা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া খেলিতেছে। বাবাজীর

উচ্ছ্বসিত অভিমান সেদিন আর বাধা মানিল না। কুঞ্চিত কপোল বহিয়া দরদর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বাবাজী বলিতে লাগিলেন, 'তুই আমায় সর্ব্বত্যাগী, পথের ভিখারী করেছিস। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে এনে তোর জন্যে এত করে রান্নাবান্না করলেম, আর তুই এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে খেলা করছিস! তোর কারুর উপর দয়ামায়া নেই। তুই চিরকাল এমনি পাষাণ! কে বলে তুই দয়াময়! তোর জন্যে বাপ মলো, মা কেঁদে সারা হল, একবার ফিরে দেখলি নি। গর্ভবতী সীতাকে বিনা দোষে বনে দিলি। যে তোকে বৈ জানত না, সেই লক্ষ্মণ ভাইকে তুই ত্যাগ করলি। এখন ওঠ, খাবি আয়।' বাবাজীর কথায় রামলালা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, যেন এমন সব আজগুবি কথা সে জানে না, কখন শুনেও নাই। বাবাজী শেষে তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইতে বসাইলেন।

এমনি করিয়া এই দুই প্রবীন ও নবীন ভক্তকে লইয়া রামলালা অপূর্ব্বভাবে খেলা করিতে লাগিল। সাধু-সন্ন্যাসীগণ অধিক দিন এক স্থানে বাস করেন না, কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া গেল, জটাধারীর নড়িবার নামটী নাই। রামলালাকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিতেছেন না, আর তাহাকে ফেলিয়া যাইতেও পা উঠিতেছে না। অবশেষে একদিন সাধু অষ্টধাতু-নির্ম্মিত রামলালা-বিগ্রহ হস্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে আসিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, 'আমার আন্তরিক অভিলাষ, হৃদয়ের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। রামলালা আমার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া অভীপ্সিতরূপে দর্শন দিয়াছে। উহার ইচ্ছা নয়, তোমার সঙ্গ

ত্যাগ করিয়া কোথাও যায়। আমাকে বলিয়াছে, তোমার কাছে থাকিলে ও সুখে থাকিবে। ওর সুখেই যে আমার সুখ, এতদিন সে কথা ও আমাকে বুঝিতে দেয় নাই। এখন বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, প্রেমাস্পদের সুখেই প্রেমিকের সুখ। তাই আজ আমার সর্ব্বস্বধনকে তোমার হাতে সমর্পণ করে, নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারছি। তোমার রামলালা তুমি নাও, আমি চলিলাম।" বলিয়া রামলালার মুখচুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ করিয়া সাধু বিদায় লইলেন। অদ্যাপিও সে বিগ্রহমূর্ত্তি দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরে বিদ্যমান। কিন্তু সে সজীব প্রাণময় রামলালা এখন কোথায়?

(১২)

অনন্ত ভাবময়ী প্রকৃতির অনন্ত লীলা। সংসার-বিরাগী সর্ব্ব-ত্যাগী ভক্তের জীবনে সেই লীলারস আস্বাদনই একমাত্র ভোগের নিদান ও সুখের উপাদান। তন্মধ্যে কেহ কেহ একটিমাত্র ভাব ও রস আশ্রয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু ভক্তি-রাজ্যের রাজরাজেশ্বর রসিকশেখর শ্রীরামকৃষ্ণ একটিমাত্র রসে ভাসমান হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। রসসিন্ধু-লীলা-রঙ্গে তরঙ্গে তরঙ্গে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিয়াছেন।

কোন সময় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রের তীরে যে সর্ব্বদা বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে, তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়েও মার কাছে সর্ব্বদা

থেকেও আমার তখন মনে হ'ত, অনন্ত ভাবময়ী অনন্তরূপিনী মাকে নানা ভাবে ও নানা রূপে দেখ্‌ব।"

এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা দেখিতে পাই, বাল্যকালে গৃহ-বিগ্রহ রঘুবীরের উপাসনায় তন্ময়। পরে কৈশোরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীভবতারিণীর আরাধনায় উন্মত্ত। তারপর শ্রীশ্রীজগদম্বিকার কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়া ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর সহায়তায় শক্তিতন্ত্র সাধনায় নিমগ্ন। ক্রমে বৈষ্ণবতন্ত্র মতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-ভাবের সাধনা শেষ হইয়া গেল। অতঃপর মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার মধুর ভাব আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চিত্ত এক্ষণে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আবার কৃষ্ণনাম-তরঙ্গে উদ্যানের বৃক্ষপত্র-সকল দুলিতে লাগিল। ভাগীরথী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। 'হা কৃষ্ণ—যো কৃষ্ণ' করিয়া আবার সেই আকুল উৎকণ্ঠা, ব্যাকুল মিনতি, কাতর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কৃষ্ট-বিরহ-সন্তপ্ত হৃদিভেদী শ্বাস ও হা-হুতাশ আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল।

হৃদয় মাতুলের এ সকল ব্যবহারে একরূপ অভ্যস্ত ছিল, তথাপি ঈশ্বর-বিরহের মহাভাবে যে সাধকের সর্ব্বশরীরে প্রতি লোমকূপ দিয়া স্বেদক্ষরণের ন্যায় শোণিতপাত হয়, ইহা তাহার সহজ বুদ্ধির অতীত। কিন্তু বুঝুক আর নাই বুঝুক, তাহার মাতুলের পূত হৃদয়ে এই প্রজ্বলিত প্রেম-বহ্নিতে যে অচিরাৎ সিদ্ধির সুধাধারা বর্ষিত হইবে, অষ্টবর্ষের অভ্যাসে তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। হইলও তাহাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত চরম সাধনা—মধুর ভাবে সিদ্ধ হইলেন।

ইহার এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রাদেবী

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া গঙ্গাতীরবাসিনী হইয়াছেন। ধীরে ধীরে সায়াহ্নের অবসাদ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, বৃদ্ধ শরীর আর সংসার-ভার বহন করিতে চাহে না, মধ্যমা বধূ এখন গৃহধর্ম্মে দেবকর্ম্মে সুশিক্ষিত। বৃদ্ধা শ্বশ্রুঠাকুরাণীকে শান্তির অবসর দিবার নিমিত্ত সংসার ও রঘুবীরের ভার তিনি এখন যেমন আদরে গ্রহণ, তেমনি অনায়াসে বহন করিতেও পারিবেন। মাতৃ-পিতৃহীন জ্যেষ্ঠপৌত্র অক্ষয়ও এখন মানুষ হইয়াছে। মাতার নিঃশঙ্ক অঞ্চল-আচ্ছাদন আর তাহার প্রয়োজন নাই। তবে আর কেন? গণা দিন ত ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে—আর কেন? এ জঞ্জাল ঘাঁটা কিসের জন্য? মধ্যম পুত্র রামেশ্বর এখন যৌবনের শেষ সীমায়। যদিচ সংসারে তাঁহার তেমন আঁট নাই, তবুও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া একরকম স্থিতি হইয়াছেন। বৃদ্ধার এক চিন্তা গদাধর। বাল্য হইতেই সে উদাসীন, বিবাহ করিয়াও সংসারী হইল না। যাহার জন্য মাতার নানা দুর্ভাবনা, ঈশ্বরের আশ্চর্য্য নিয়মে তাহারই প্রতি তাঁহার স্নেহ সমধিক। এই পুত্রটির জন্য বৃদ্ধাকে আজীবন ভাবিতে হইয়াছে। উঃ, কি সব দিনই গিয়াছে! দক্ষিণেশ্বরে কিছুদিন ভবতারিণীর পূজা করিতে করিতে পুত্রের অদ্ভুত আচরণ, 'মা মা' বলিয়া অনিবার ক্রন্দন। লোকে প্রেতাবিষ্ট, পাগল বলিল! তাই কি একবার! দেশে গিয়া, কিছু সারিয়া বিবাহ করিয়া যেমন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল, আবার তাই! অকূলে কূল না পাইয়া বৃদ্ধা মহাদেবের কাছে ধরণা দিলেন। প্রত্যাদেশ হইল, ভয় নাই, ভাবনা নাই, পুত্রের দেবোন্মত্ততা। হউক জগন্মাতার জন্য

উন্মত্ততা, গদাধর ত তাঁহারই সন্তান। ঈশ্বর-ইচ্ছায় বড়টী হইয়াছে, কিন্তু তবু এখনও সেই বালক। শরীরের হুঁস নাই। গদাইয়ের কথা মনে হইলে মাতার চোখে স্নেহবিন্দু, স্তনে এখনও ক্ষীরধারা সঞ্চারিত হয়; বৃদ্ধার জীর্ণ, শোকদীর্ণ হৃদয়ের শিরা-উপশিরাসকল স্নেহের ব্যাথায় টন টন করিতে থাকে। গদাধরের কাছে আসিবার জন্য বৃদ্ধার মন নিয়ত ছুটিতেছে, তার উপর আর এক আকর্ষণ গঙ্গাতীর,—দর্শন স্পর্শন ত বেশী কথা,—যার বীচি-বিলসিত বায়ু গায় লাগিলে দেহ মন শুদ্ধ পবিত্র হয়! তদুপরি আবার জাগ্রত দেবতার স্থান! এই পুণ্য স্থলে, সুশীতল গঙ্গাকূলে গদাধরের কোলে মাথা রাখিয়া মৃত্যু,—বৃদ্ধার শোক-সন্তপ্ত জীবনে ইহার অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? চন্দ্রাদেবী আর ইতস্ততঃ করিলেন না। লোকান্তর ব্যতীত স্থানান্তর হইব না, এই স্থির সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিলেন।

চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিলে মথুরমোহনের মন নিরতিশয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে মথুরের মনে এক অশান্তিকর চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে—আমি গেলে বাবার সেবা-যত্নের কি হবে? আমার উপর বাবার ভার দিয়া রাণী নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি অবর্ত্তমানে? মথুরের স্ত্রী জগদম্বা অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে দুহিতার অধিক নিষ্ঠায় সেবা-যত্ন করেন। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই সেবা-পরায়ণা নারী এখন সংসারে মান্যা গণ্যা, সে আশ্রয় যখন চলিয়া যাইবে, তখন কি? তেজ,

সাহস, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা-বলে মথুর রাণীর সংসারে এখন সর্ব্বময় কর্ত্তা। কিন্তু তিনি অবিদ্যমানে অন্যান্য সরিকগণ প্রবল হইয়া উঠিবে, জগদম্বারও আর তত প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি থাকিবে না। তখন উপায়? বিষয়ী ব্যক্তির অন্তরে অর্থই সংসারের সর্ব্ব-প্রকার বিপত্তির প্রতিকার বলিয়া সর্ব্বাগ্রে উদয় হয়। কিন্তু বিষয় বা অর্থের নাম করিতে যে বাবার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, সেই সর্ব্ব-ভোগ-বিরাগী ত্যাগী মহাপুরুষের কাছে সে সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করাও যে সুকঠিন! মথুরের সাহসে কুলায় না। কিন্তু তথাপি বাবার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা মথুরকে স্থির থাকিতে দিল না। আত্মকার্য্যোদ্ধার-পটু প্রাজ্ঞ মথুর এক কৌশল করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নামে একখানা তালুক করিয়া দিবার অভিপ্রায় তিনি হৃদয়ের নিকট এমন সময় এমন ভাবে উত্থাপন করিলেন যেন কথাগুলা দূর হইতে বাবার কানে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু এই পাকচক্রের পথ দিয়াও চতুর মথুর আপনার গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রস্তাব কর্ণগোচর হইবামাত্র, ফুৎকার দিলে আগুন যেমন জ্বলিয়া উঠে, বাবার চক্ষুদ্বয় তেমনি জ্বলিয়া উঠিল। "তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস" বলিয়া তিনি উদ্যত যষ্টি করে মথুরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সে উগ্রমূর্ত্তি, মধ্যাহ্ন-জ্বালাময়ী দৃষ্টির সম্মুখে অসমসাহসী মথুর তিষ্ঠিতে পারিলেন না—দূরে সরিয়া গেলেন। কিন্তু তবুও রাণীর উদ্যমশীল জামাতা দমিলেন না। কিন্তু কিরূপে কাহার দ্বারা মতলব সিদ্ধি করিবেন, তাহা আপাততঃ অনিশ্চিত রহিল। চন্দ্রাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার

কিছুদিন পরে মথুর বুঝিলেন, পথ প্রশস্ত হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল।

মথুর লক্ষ্য করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যুষে উঠিয়া জননীসদনে গমন করেন এবং অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে তাঁহার পদধূলি লইয়া আসেন। সময়ে অসময়ে মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা পান। মথুর স্থির করিলেন, এই সুযোগ—সরলা চন্দ্রাদেবীর দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিবেন; এবং একদিন অবসর বুঝিয়া বৃদ্ধার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। প্রথমে 'ঠাকু' মা, 'ঠাকু' মা' বলিয়া আদর আপ্যায়ন, তারপর এ কথা সে কথা। এইরূপে বৃদ্ধাকে ভিজাইয়া গলাইয়া মথুর বলিলেন, "কৈ ঠাকু'মা, তুমি ত আমার কাছ থেকে কখন কিছু চাইলে না, নিলে না? আমাকে যদি সত্যি তুমি আপনার লোক বলে ভাব, তা হলে আমার মনে এ দুঃখুটুকু রেখ না। আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নাও।" ঠাকুমার মনে মহা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। এ কি আবদার, না, দান করিবার জন্য মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে? বড়লোক, ইহাদের আশ্রয়ে বসবাস, ইহাকে বিমুখ করা যায় কেমন করিয়া? কিন্তু চাহিবেনই বা কি? কোন-কিছুরই ত অনটন নাই। দেবতার প্রসাদ—নিত্য রাজভোগ আসিতেছে। আর বস্ত্র? মথুর যদি মনে করিয়া থাকেন, বস্ত্রের অভাব, তা হলে ত তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। বৃদ্ধা তখনই উঠিয়া কাপড়ের ক্ষুদ্র পুঁটুলিটী বাহির করিয়া দেখাইলেন—"এই দেখ, দাদা, আমার কত কাপড়। তোমার কল্যাণে আমার নাই কি যে চাইব!" মথুর তথাপি

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, "সে হবে না, ঠাকু'মা, আমার কাছ থেকে তোমাকে কিছু নিতে হবে।" মথুরের পীড়াপীড়িতে বৃদ্ধা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন; আপনাকে নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিয়া অবশেষে বলিলেন, "একান্ত না ছাড়, তবে আমার গুল মুখে দেবার গুল ফুরিয়ে গেছে, চার পয়সার দোক্তা তামাক কিনে দাও।" মথুরের আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। সজল নয়নে এই সারল্য-প্রতিমার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বাবাকে বিষয় দান করিবার বাসনা ইহজন্মের মত বিসর্জ্জন করিলেন।

বাবাকে মথুর অনেকবার অনেকরূপ অবস্থাতে দেখিয়া বুঝিয়াছেন যে, ভোগৈশ্বর্য্য-সুখে এই দেব-চরিত্র পুরুষশেখর সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। রমণীর মোহিনীতে ইহাঁর মন টলে না, ঐশ্বর্য্যে গলে না। কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী, কৃষ্ণানুরাগী এই মন পদ্মপত্রগত জলের মত নির্লিপ্ত হইয়া সংসারে ভাসিতেছে। বাবাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া মথুর অনন্যচিত্তে সেবা করেন। বাবার জন্য সোণা-রূপার বাসন গড়াইয়া তাহাতে খাওয়ান। সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া দেন, বাবার তামাক খাইবার জন্য সোণার আল্‌বোলা প্রস্তুত হইয়াছে। বাবা বালকের মত এই সকল লইয়া ক্ষণিক আনন্দ করেন, তারপর কোথায় কি থাকে, তাহা ঠিক থাকে না। সময় সময় দেহবোধ পর্য্যন্ত নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একবার ভাব-সমাধিমগ্ন হইয়া জ্বলন্ত গুলের উপর পড়িয়া গিয়াছিলেন। গুল পৃষ্ঠদেশ দগ্ধ করিয়া চর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করে, তথাপি বাবার হুঁস হয় নাই। আর একবার হাজার টাকা দিয়া এক জোড়া

বারাণসী-শাল কিনিয়া মথুর নিজ হস্তে বাবার গায় জড়াইয়া দিলেন। শাল পরিয়া বাবার সে বালকের মত আনন্দ দেখে কে? একবার মুখটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজ গাত্রস্থ শালখানিকে নিরীক্ষণ করেন, এবং অপরসকলে লক্ষ্য করিতেছে কি না, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার উৎসুক দৃষ্টি চারিদিকে ধাবিত হয়! কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সেই পুলক-প্রফুল্ল মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিল, মথুরের আদরের বাবা তাঁহার প্রদত্ত বহুমূল্য উপহার পদ-দলিত করিতেছেন আর বলিতেছেন "ছি, ছি, ছি, এগুলো অহঙ্কারের জড়, এতে পরমানন্দ লাভ হয় না, এতে আছে কি?" অন্য একদিন উৎকৃষ্ট বারাণসী-চেলীর জোড় পরাইয়া দিবার পর বাবা দেব-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীভবতারিনীর মন্দিরে উপনীত হইয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িতেন। সেদিন মন্দিরতল ঈষৎ জলসিক্ত ছিল। সেই আর্দ্র ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গ হইলে পাছে বহুমূল্য বস্ত্রখানি নষ্ট হইয়া যায়, এই ভাবনায় ক্ষণিকের নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত কুঞ্চিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ ছি ছি করিয়া সেই চেলীর জোড় ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া থুৎকার দিতে লাগিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত মথুরের কর্ণগোচর হয়, কিন্তু ক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক, তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলেন—"বাবা বেশ করেছেন!"

মথুর বাবার সর্ব্বপ্রকার গর্হিত আচরণের পোষকতা করেন বলিয়া দেব-সেবার কর্ম্মচারীগণ নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু তাঁহার কালীঘাটের পুরোহিত একজন হালদার তাহাতে অন্তরে অন্তরে

জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল বহুমূল্য বস্তুর অপচয়-কাহিনী তাহাকে ঈর্ষায় জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। হাজার টাকার শাল যে পদ-দলিত করে, তার চাল নিশ্চয় গভীর নীর-বিহারী রোহিতের মত, সম্ভবতঃ একটা-কিছু বড়গোছের দাঁউ মারিবার জন্য। আবার পাগলের ভাণটুকুও আছে, যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! কিন্তু বাবুকে এমন করিয়া বশ করিল কিরূপে? খুব সম্ভব বশীকরণ-মন্ত্রে—লোকটা তান্ত্রিক কি না। কিন্তু যেমন করে হোক, ওর কাছ থেকে মন্ত্রটা জেনে নিতে হবে। হাল্‌দার তর্কে তর্কে ফিরিতে লাগিল। সয়তানের সুযোগ শীঘ্রই আসিয়া উদয় হয়। একদিন দেখিল, মথুরের বৈঠকখানা ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া আছেন, আর কেহ তথায় নাই। তখনই ঘরে ঢুকিয়া এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিল—"ও বামুন, বাবুকে কি মন্তরে বশ করেছিস্, বলে দে না। ভিট্‌কিল্‌মি করে পড়ে রইলি যে, বল না।" পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াও যখন সেই ভূপতিত অর্দ্ধচেতন শরীর হইতে কোন প্রকার সাড়া আসিল না, তখন বিষম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে সেই নিশ্চেষ্ট দেহ পদ-দলিত করিয়া, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর কোমল কিশলয় হইতেও সুকোমল ছিল, আঘাত গুরুতর বাজিল। কিছুক্ষণ পরে হৃদয়কে বেদনাস্থান দেখাইলে অসহ্য ক্রোধে তাহার চক্ষু দিয়া আগুন ছিট্‌কাইতে লাগিল। আত্মরক্ষরায় অক্ষম, শিশুর ন্যায় অসহায়, তাহার নিরপরাধ মাতুলের উপর এই অত্যাচার! কিন্তু সেই পাষণ্ডের দণ্ডবিধান করিতে উঠিবার পূর্ব্বেই তাহার দুর্ব্বোধ মাতুল বলিলেন

—"ও রে, হৃদু, তুই আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নে যে, "সেজবাবুকে (মথুরকে) এ কথা বল্‌ব না।"—পাছে সে ব্রাহ্মণের কোন অনিষ্ট হয়! সত্যনিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ একবার যাহা বলিতেন, কখনই তাহার অন্যথা হইত না। ঘটনাক্রমে কোন সময় এই ব্যাপার অবগত হইয়া মথুর বলিয়াছিলেন, আমি তখন জানতে পার্‌লে বামুনের মাথা থাক্‌ত না। এতদিন পরেও তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি ও রক্তচক্ষু দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য অপরাধে ইহার পূর্ব্বেই সে হালদার-ব্রাহ্মণ মথুরের বিরাগভাজন হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে। সুতরাং হৃতশিকার ব্যাঘ্রের মত তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধ কেবল নিষ্ফল গর্জ্জনে শান্তিলাভ করিল। কিন্তু বাবার এই দেবদুর্লভ ক্ষমাশীলতায় মথুরমোহন অপার বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। আঘাতে প্রতিঘাত-পরাঙ্মুখ! বিষম অনর্থ করিলেও কথা কহে না, কিন্তু অর্থের নাম করিলে তাড়িয়া আসে। এই দীন হীন ব্রাহ্মণকুমার কে? ইনি বিদ্যাবিহীন হইয়াও মহা জ্ঞানী, জ্ঞানী হইয়াও নিরভিমান, নিরভিমান হইয়াও মহা তেজস্বী—ইনি কে? অসহ্য যন্ত্রণায় মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি কাতর প্রার্থনা করিয়া ইঁহার স্পর্শে আরোগ্যলাভ করিয়াছে। বিষয়সংক্রান্ত বিরোধে খুন হইয়াছে, মথুর নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, এই অদ্ভুত পুরুষের আশীর্ব্বাদে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। ইঁহার স্পর্শ অব্যর্থ শক্তিসম্পন্ন, বাক্য অমোঘ, ইচ্ছায় আইনের উদ্যত দণ্ড খসিয়া পড়ে! ইনি নারী লইয়াও ব্রহ্মচারী; সংসারী হইয়াও উদাসী; কি অজেয় ইঁহার সংযম, অটল ইঁহার সত্যনিষ্ঠা! কাম-কাঞ্চনে কি অদ্ভুত অনাসক্তি, কি মাতুয়ারা

ভক্তি, সরস রসিকতায় কি অফুরন্ত শক্তি! কি অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা, অপার্থিব রসলতা, আবার শিশুর ন্যায় অসহায় হইয়াও কি সতেজ নির্ভীকতা! কি অভাবনীয় উদারতা, আর স্বয়ং শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইয়াও মথুরমোহনের ন্যায়, অন্যায় অনাচারীর উপর কি স্বতরুৎসারিত করুণা, সুগভীর ভালবাসা! মথুর যতই দেখিতে লাগিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ততই এই বিচিত্র চরিত্রের কোমল-কঠোর, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্য তাঁহার মুগ্ধ হৃদয়ে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর রশ্মিপাত করিতে লাগিল।

শ্যামনামে তন্ময় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাগীরথী-তীরে চাঁদনীর সোপানে বসিয়াছিলেন, সহসা তাঁহার মনে হইল, কে যেন অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চাহিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘাকার অমিত তেজঃসম্পন্ন সন্ন্যাসী। লোটা, চিম্‌টা, চর্ম্মাসনমাত্র তাঁহার সাথি, আর একখানি মোটা চাদরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। কিন্তু সে আবরণ তাঁহার অঙ্গ-জ্যোতি ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ইনি বিখ্যাত নাগা-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু শ্রীমৎ স্বামী তোতাপুরী, পুরী-দর্শন করিয়া পশ্চিমে নিজ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। পথে এই সুরম্য দেবালয়ের অতিথি-শালায় তিন দিন বিশ্রাম করিবেন। নিজ মঠ ভিন্ন তোতা ত্রিরাত্রির অধিক কোথাও অতিবাহিত করিতেন না; এবং মুক্ত অম্বর ভিন্ন মাথার উপর তিনি অন্য কোন আচ্ছাদন রাখিতেন না।

সুন্দর সুফলা ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার নিমিত্ত কৃষীর চিত্ত যেমন পুলকিত হয়, সাধনার সুযোগ্য অধিকারী পাইলে তাহাকে সাধনলব্ধ দিব্যানন্দ উপভোগ করাইবার জন্য সিদ্ধপুরুষগণ তেমনি

ব্যগ্র হইয়া উঠেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্রই তোতা বুঝিয়াছিলেন, সবিকল্প ভাব-সমাধিতে এই উচ্চ অধিকারী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এখন নির্ব্বিকল্প সমাধিভূমিতে ইঁহাকে আরোহণ করাইতে পারিলেই ইনি পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। তোতা প্রশ্ন করিলেন—"তুমি বেদান্ত সাধনা কর্‌বে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে তাঁহার মুখ চাহিয়া উত্তর দিলেন—"সে কথা আমি জানি নি।"

চিরদিন আত্ম-নির্ভরশীল, নিজ পুরুষকারের উপর দৃঢ় প্রত্যয়ী তোতা ততোধিক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি সাধনা করবে কি না তুমি জান না, তবে কে জানে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমার মা জানেন। মাকে জিজ্ঞাসা করে তোমাকে বল্‌তে পারি।"

মা শব্দে তোতা বুঝিলেন—গর্ভধারিনী। বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর গে। কিন্তু বেশী দেরী না হয়, আমি শীঘ্রই চলে যাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া শ্রীভবতারিণীর মন্দির-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তোতার নয়ন তাঁহার অনুসরণ করিল! সত্যই মায়ের কাছে চলিল! কিন্তু মন্দিরের দিকে কোথায় যায়—মা কি ঐখানে? ঐ মন্দিরের দেবী? তান্ত্রিকের আকর বাঙ্গালাদেশে আর বেশী কি আশা করা যায়? কিন্তু যদি বেদান্তমতে সাধনা করে, অচিরেই সব ভ্রান্তি দূর হবে। তখন জ্ঞান হবে, যা কিছু আমরা দেখি, ব্রহ্মের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তখন আর দেব-দেবীকে পিতৃমাতৃজ্ঞান, তাদের পূজা-অর্চ্চনা, আদেশ-

প্রার্থনা এরূপ কোন কুসংস্কার থাক্‌বে না। তোতা ধীরে ধীরে অদূরে পঞ্চবটীমূলে আসন পাতিয়া ধূনি জ্বালিলেন। অনতিপরে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার মায়ের আদেশ হইয়াছে। তোতাপুরী বলিলেন, "বেশ হইয়াছে, আগামী শুভ-দিনেই তোমাকে দীক্ষা দিব।" ইতিমধ্যে বেদান্ত-বিহিত সাধনা সম্বন্ধে শিষ্যকে তিনি বিবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

কিন্তু দীক্ষারম্ভের পূর্ব্বেই এক গোল বাধিল। শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রসাধন-সহায়স্বরূপা ভৈরবী-ব্রাহ্মণী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—"বাবা, এই সব বৈদান্তিক সাধুদের শুষ্ক ভাব, তুমি ওদের সঙ্গে অত ক'রে মিশ'না, তোমার প্রেম-ভক্তির ভাব নষ্ট হয়ে যাবে।" গুরুস্থানীয়া জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে হাঁ-না, স্পষ্টতঃ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার বিশেষ ভাবনা হইল, নিজ জননীর সম্বন্ধে। একে চন্দ্রাদেবীর শোকজীর্ণ হৃদয়, তার উপর জীবনে এখন তিনিই তাঁর প্রধান অবলম্বন। তাঁহাকে দণ্ডীবেশে দেখিলে মাতা হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা পাইবেন। সেই যে শৈশবে কামারপুকুরের অতিথিশালায় আগত সাধুগণ একদিন তাঁহাকে সন্ন্যাসীর মত সাজাইয়াছিলেন, সেদিন তাঁহাকে বুকে ধরিয়া মায়ের সে কি কান্না! এই বৃদ্ধ বয়সে মা কি তাঁর সন্ন্যাসী-বেশ দেখিতে পারিবেন! সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তোতা তাঁহাকে যথারীতি সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিবার কথা বলিলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন—"যদি গোপনে ঐ সকল আচার পালন করা চলে তা হলে করতে পারি। প্রকাশ্যভাবে ঐ সকল ধারণ করে মার মনে ব্যাথা দিতে পারব না। প্রকাশ্যভাবে

করা কি বিশেষ আবশ্যক?” কুছ্ জরুরৎ নেহি। যদি মনে রং ধরে, গৈরিকের বহির্ব্বাস দরকার হয় না। তোতা বলিলেন, “আমি তোমায় গোপনেই দীক্ষা দিব।”

অতঃপর শুভ দিন শুভ মুহূর্ত্ত আগত হইলে তোতা তাঁহার পরম শিষ্যকে লইয়া পঞ্চবটী সন্নিকটে সাধন-কুটীরে উপনীত হইলেন। পরে হোমাদি-পূতঃ অনুষ্ঠানসকল সম্পন্ন করিয়া, ব্রহ্মজ্ঞান-পিপাসু সাধককে স্থিরভাবে বসিয়া, মনকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকল্প করিয়া, আত্মধ্যানে ডুবিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার উৎকট চেষ্টা করিয়াও মনকে নাম-রূপের অতীত দেশে প্রেরণ করিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার চিণ্ময়ী মূর্ত্তি আসিয়া তাহার তোরণ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অবশেষে পুনঃ পুনঃ প্রয়াসে হতাশ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাকে বলিলেন, “মন কিছুতেই নির্ব্বিকল্প হ’ল না, আমি পারলাম না।”

তোতা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।” কেঁও! হোগা নেই?” বলিয়া কুটীরের ভিতর হইতে একখানা ভাঙ্গা কাচ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তারপর সেই কাচের সূচলো অগ্র-ভাগ শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রূ-সন্ধিস্থলে সজোরে বিঁধিয়া দিয়া বলিলেন, “হিঁয়া মন ধরো!” শিষ্য তখন পুনর্ব্বার দৃঢ়-সংকল্প হইয়া ধ্যানরত হইলেন। ইহার পর যখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার মূর্ত্তি আসিয়া অন্তরায় হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, তখন জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে সেই মূর্ত্তি দুখানা করে কেটে ফেললাম।” তারপর মন নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে বিলীন হইয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ

নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইলেন। শিষ্যের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, পরীক্ষায় অবগত হইয়া, পাছে সহসা কেহ তার সমাধি ভঙ্গ করে এই আশঙ্কায় তোতা কুটীরদ্বারে চাবি লাগাইয়া পঞ্চবটীমূলে আপনার আসনে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন—শিষ্য ডাকিলেই দ্বার খুলিয়া দিবেন। কিন্তু তিনদিন তিনরাত্রি সমানে অতিবাহিত হইয়া গেল, সে ডাক আসিয়া তাঁহার কানে পৌছিল না।

কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে তোতা তখন আপনিই দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে যে দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল, তাহাতে আর তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তোতা দেখিলেন, শিষ্য সেই একভাবে উপবিষ্ট। শরীরে প্রাণ-স্পন্দন স্তব্ধ! চিত্ত নিবাত দীপশিখার ন্যায় নিষ্কম্প, বদনমণ্ডল ব্রহ্মজ্যোতিরুদ্ভাসিত—নিরালোক কুটীর আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

তোতা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, চল্লিশ বৎসরের উৎকট সাধনায় যে সিদ্ধি তাঁহার আয়ত্ব হইয়াছে, একদিনের সাধনায় শাখাচ্যুত অনায়াসলব্ধ ফলের ন্যায় এই দিব্য পুরুষের তাহা করগত হইল। এ কি দৈবী মায়া! তোতার অন্তর আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। অতঃপর শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া দ্বারা তিনি শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করিলেন।

কঠোর সন্ন্যাসী তোতা কোথাও ত্রিরাত্রির অধিক যাপন করি-তেন না। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া আজকালি করিয়া একাদি-ক্রমে একাদশ মাস চলিয়া গেল। এই অদ্ভুত শিষ্যের প্রেমে তাহার নিকট বিদায় চাহিতেও যেমন মুখে কথা ফুটে না, তাহাকে ছাড়িয়া

যাইতেও তেমনি পা উঠে না। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরু-শিষ্যে যেমন স্নেহের তেমনি ভাবেরও আদান প্রদান চলিতে লাগিল। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তোমার তবে নিত্য ধ্যান করবার আবশ্যক কি?" তোতা তাঁহার পিতলের লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন—"এই লোটা যদি রোজ না মাজি, ময়লা ধরে না কি? ধ্যান-মার্জ্জিত না হলে মনেও তেমনি মালিন্য জমে।" শিষ্য বলিলেন, "আর লোটা যদি সোণার হয়?" তোতা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তা বটে।"

তোতা একটু কোপনস্বভাব ছিলেন। গুরু-শিষ্যে আর একদিন বেদান্ত-চর্চ্চা হইতেছিল। উভয়েরই মন তন্ময়, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে তোতার ধূনী হইতে একখানি কাঠ টানিয়া আগুন লইতে লাগিল। প্রথমে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই, অবশেষে তাহার কার্য্যের উপর যখন তোতার দৃষ্টি পড়িল, তখন তিনি অসহ্য ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। নাগা-সাধু-সম্প্রদায়ের নিকট ধূনী অতি পবিত্র পদার্থ। যে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাতে তাম্রকূট-সেবন? তোতা তিরস্কার করিতে করিতে ক্রমে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া চিম্‌টা তুলিয়া লইয়া অপরাধীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই রোষাভিনয় দেখিতেছিলেন, সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দূর শালা, তুমি না বল, সব ব্রহ্ম, সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ?" চিমটা ফেলিয়া দিয়া তোতা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঠিক বলেছ। আজ হতে ক্রোধ পরিত্যাগ করিলাম।"

R

পরমহংসদেব

ভক্তিমার্গে ভাব-রসাবলম্বনে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা শ্রীমৎস্বামী তোতার নিকট নিছক পাগলামী বলিয়া মনে হইত। শান্তিময়ী সন্ধ্যা যখন সংসার-রঙ্গমঞ্চের উপর যবনিকাপাত করিতেন এবং ঝিল্লির ঐকতান-বাদনে দিক্‌সকল মুখরিত হইয়া উঠিত, আর সন্ধ্যোপাসনার জন্য জাহ্নবী রক্ত পট্টবাসে সজ্জিতা হইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সে সময় সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ ও সর্ব্বপ্রকার আলোচনা বন্ধ করিয়া করতালি দিয়া হরিনাম করিতেন। ধূনীর সন্নিধানে বসিয়া গুরু-শিষ্যে যেদিন বেদান্ত ও ব্রহ্ম-বিষয়ে আলোচনা হইত, সেদিন আলোচনা ছাড়িয়া শিষ্যকে ঐরূপ করিতে দেখিলে তোতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। কোন কোন দিন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া ফেলিতেন, "আরে, রোটী ঠোক্‌তে হো কাঁহে?" সাধু-সন্ন্যাসিগণ রুটি বেলিবার নিমিত্ত বেলন-চাকি সঙ্গে লইয়া ত ফেরেন না। হাতে আটার নেচি লইয়া হাততালির মত চাপ্‌ড়াইয়া চাপড়াইয়া রুটি প্রস্তুত করেন। তোতার বিদ্রূপের লক্ষ্য তাহাই। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিতেন, "দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি, আর তুমি বল্‌ছ রুটি ঠুক্‌ছ!"

ব্রহ্মের তুরীয় ভাব ব্যতীত সগুণ ভাবের উপাসনা, নিম্নাধিকারীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, বেদান্তের উচ্চাধিকারীর পক্ষে তাহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তোতার ধারণা ছিল। যাঁহার যোগে নির্গুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন, সেই ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি মায়িক ভাণমাত্র জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভের প্রয়াসকে তোতা পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যে পুরুষকার, ধ্যান ধারণা প্রভৃতির অবলম্বনে ব্রহ্মের তুরীয় ভাবে

উপনীত হইতে হয়, সে সকল যে সেই মহাশক্তির ঐশ্বর্য্য ও অধিকারভুক্ত সে তত্ত্ব তোতার ধারণাতীত। অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যে অভেদ, আজন্ম পুরুষ-কারাবলম্বী সন্ন্যাসী তোতা তাহা স্বীকার করিতেন না। এই বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্কের পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তোতাকে বলিয়াছিলেন, "মা যখন মানাবেন তখন মান্‌বে।"

আলোচনা ও ব্রহ্মপ্রসঙ্গে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া প্রায় এগার মাস পূর্ণ হইয়া আসিল। গুরু-শিষ্য উভয়েই সদানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যকর পশ্চিম-প্রদেশ-বাসী তোতা বঙ্গদেশে সুদীর্ঘ প্রবাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। রোগ—রক্তামাশয়। পীড়ার যন্ত্রণায়, বিশেষতঃ পেটের অসহ্য বেদনায় তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ মনও ক্রমশঃ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তোতা ক্রমে এই হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কেন এই রোগ-যন্ত্রণার আধার, ভূতের বোঝাটাকে বৃথা বহিয়া বেড়ান? বেদান্তের বিচার এই দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না বটে, কিন্তু ইহার যন্ত্রণা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে অবাধ্য শরীরটাকে আবশ্যক কি? ইহাতে যতটুকু প্রয়োজন তাহা ত সিদ্ধ হইয়াছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য উপলব্ধি করিতে আর বাকি নাই। মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছে, এখন আর বোতলটা থাকিলেই কি, ভাঙ্গিলেই কি? ব্রহ্মবিদ্ তোতা সঙ্কল্প স্থির করিলেন, ব্রহ্মযোগ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবারি জাহ্নবীতে রোগজীর্ণ দেহ বিসর্জ্জন করিবেন।

ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধসঙ্কল্প পুরুষদিগের চিন্তা ও কার্য্যে অধিক ব্যবধান থাকে না। তোতা মনস্থির করিয়া উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া আসিল। কদাচিৎ পেচকের গভীর ঘুৎকার, প্রহরে প্রহরে শৃগালকুলের দূর কোলাহল ও অবিশ্রান্ত ঝিল্লিরব ভিন্ন অন্য শব্দ নাই। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীও যেন আজ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অন্তিম মিলন আকাঙ্ক্ষায় স্থির হইয়া আছেন, তাঁহার কলগানও আজ স্তব্ধ। তোতা প্রজ্জ্বলিত ধূনীকে প্রণাম করিলেন, পরে ধীরে ধীরে জাহ্নবীনীরে অবতরণ করিয়া ক্রমশঃ ডুব-জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যতই অগ্রসর হন, তাঁহার জানু অতিক্রম করিয়া জল আর উঠে না! ক্রমে পরপারের বৃক্ষরাজি সন্নিকট হইল, বিস্মিত তোতা বুঝিলেন, গঙ্গার মধ্যভাগ পার হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কি বিচিত্র দৈবী মায়া, অকিঞ্চিৎকর দেহটাকে নিমগ্ন করিবার মত জলও আজ জাহ্নবীতে নাই! সহসা তোতার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে যেন বিশ্বদৃশ্যের উপর হইতে একটী দুর্ভেদ্য আবরণ খসিয়া পড়িল। বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে তোতা দেখিলেন, এক অগাধ, অপার, অনন্ত শক্তি-সাগর বিচিত্র লীলায় তরঙ্গ-ভঙ্গ-চপল। বুঝিলেন, এই বিরাট্ চিন্ময় শক্তি-সিন্ধুর নিষ্ক্রিয় নিস্তরঙ্গ তুরীয় অবস্থাই ব্রহ্মনামে অভিহিত। নিশ্চল, নিষ্ক্রিয় প্রশান্ত অবস্থায় যিনি ব্রহ্ম, লীলায় তিনিই জগজ্জননী, মহাশক্তি মা! ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। এই মহা-শক্তি-সাগরে কত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হইতেছে, কত হরি-হর-ব্রহ্মা তলাইয়া যাইতেছে! এই মহাশক্তির অনুশাসনে বায়ু বহে,

সূর্য্য তাপ দেয়, মেঘ বর্ষে, ফুল ফুটে! ইনিই অনন্ত ভাবের ভাবিনী, অনন্তরূপিনী! কোথাও শত্রু, কোথাও সুহৃদ; কোথাও প্রভুরূপে পালক, কোনখানে ভৃত্যরূপে সেবক! ইনিই মাতৃরূপে প্রসব করিয়া সন্ততিরূপে স্তন্যপান করেন। ইনি কোনখানে রাজরাণী, কোনখানে ভিখারিণী; কোথাও সতী, কোথাও লোক-মনোমোহিনী স্বৈরিণী! ইনিই বন্ধনকারিণী মহামায়া, আবার ইনিই বন্ধনহারিণী তারিণী। ইনিই মতি, গতি, প্রবৃত্তি, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার। ইঁহারই দুর্ণিবার ইচ্ছায় ক্ষুদ্র কীট হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরিচালিত। স্বরাট, বিরাট, আধার, আধেয়, জ্ঞান, অজ্ঞান, বিদ্যা, অবিদ্যা, ইনিই সব! পাপ, পুণ্য, দৈন্য, সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, জন্ম, জরা, জীবন, মৃত্যু, সবই ইচ্ছাময়ী এই মা। এতদিন যিনি তোতাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিও এই মা! আর আজ যাঁহার অপার করুণায় তাঁহার অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল—তিনিও এই মা! অসহ্য বিস্ময় ও পুলকে তোতার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল! অদ্ভুত শিষ্যকে স্মরণ করিয়া 'মা মা' বলিতে বলিতে তিনি পঞ্চবটীমূলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরদিন প্রত্যুষে তোতার তত্ত্ব করিতে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, যেন সে মানুষই নয়! রোগের বিবর্ণতা বিদূরিত হইয়া বদনমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়াছে! তোতা আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শিষ্যকে বলিলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, ভবতারিণীকে প্রণাম করিয়া অনতিকাল পরে পশ্চিমাভিমুখে পদ-চালনা করিলেন।

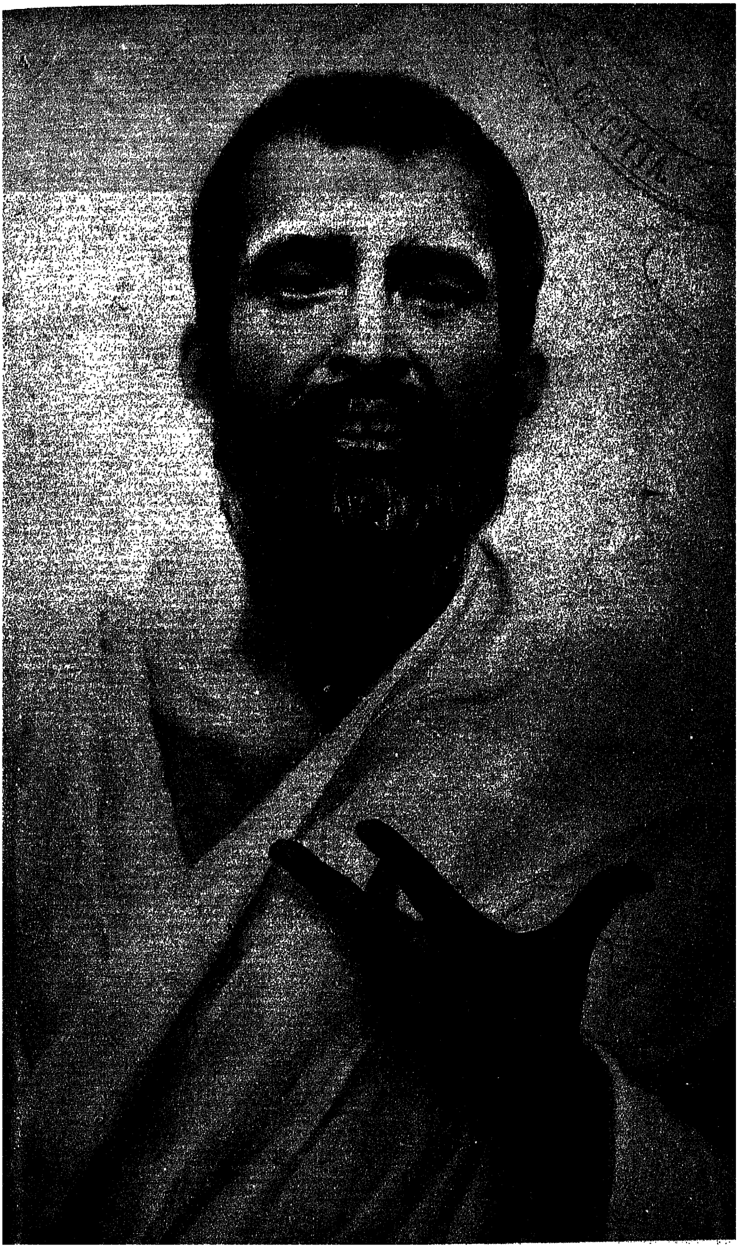
ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে মথুরমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী জগদম্বা-

দাসী মৃত্যুশয্যায়। অবশেষে চিকিৎসকগণ যখন হতাশ হইয়া রোগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন ভগ্নহৃদয় মথুর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া সজল নয়নে বলিলেন, "বাবা, এতদিনে তোমার সেবা থেকেও আমায় বঞ্চিত হতে হ'ল।" মথুরের হতাশ কাতরোক্তিতে বাবার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি মথুরকে আশ্বাস দিলেন, "ভয় নাই, ভাল হবে।" মথুর গৃহে ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, রোগিনীর অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জগদম্বাদাসী এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

তোতা চলিয়া যাইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির করিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া কাটাইয়া দিবেন। তাঁহাকে দিনরাত সমাধিমগ্ন দেখিয়া ভাগিনেয় হৃদয় শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল। নাকের ভিতর মুখের ভিতর মাছি ঢুকিতেছে, মাতুলের সাড় নাই। জলটুকু পর্য্যন্ত উদরস্থ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উপর দেব-সেবার কর্ম্মচারীগণ সকলেই বিরূপ। কিছুদিন হইল, হলধারীও পূজকের পদ পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারের পুত্র অক্ষয় ব্রতী হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে ত বালক বলিলেই হয়—বয়স সতর আঠার বৎসর মাত্র। সুতরাং কাহার সহিত পরামর্শ করিবে, কেমন করিয়া মাতুলকে খাওয়াইবে, স্থির করিতে না পারিয়া হৃদয় অকূলে পড়িল। কিন্তু এই অকূলে বিধাতা কূল দিলেন। সেই সময় দেবালয়ে এক সাধু আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা বুঝিয়া উৎকট ব্যবস্থা করিলেন। সাধুর হাতে রুলের মত একগাছি লাঠি থাকিত। তদ্দ্বারা প্রহার করিতে করিতে সামান্য হুঁস হইবামাত্র

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে আহার গুঁজিয়া দিতেন। তাহার কতক কোন দিন গলাধঃকরণ হইত, কোন দিন নয়। ইহাতে জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু ছয় মাস ক্রমান্বয়ে এইভাবে কাটায় শ্রীরামকৃষ্ণ দারুণ উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তিনি বলিতেন, "রোগের যন্ত্রণায় তারপর থেকে শরীরের দিকে একটু একটু হুঁস এলো।" হুঁস আসিল বটে, কিন্তু দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাঁহার অদ্বৈত ভাবের ঘোর থাকিত।

এই সময় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁদনীয় উপর হইতে ভাবাবেশে গঙ্গা দর্শন করিতেছিলেন। কিছুক্ষণের পর তীর-সংলগ্ন তুইখানি নৌকার দাঁড়ি-মাঝিদের মধ্যে কলহ বাধে এবং এই কলহের ফলে বলবান্ এক ব্যক্তি ক্ষীণজীবী একটি লোকের পৃষ্ঠদেশে সবলে চপেটাঘাত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনি নিজ পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। হৃদয় ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, মাতুল পৃষ্ঠদেশের যে স্থানে হস্ত বুলাইতেছেন, সেখানে রক্তের ছড়ার মত পাঁচটি আঙ্গুলের দাগ পড়িয়াছে। বাস্তব জগতের অধিবাসী হৃদয় ভাবিল, মাতুলকে ঐ ভাবে কে নির্ম্মম আঘাত করিয়াছে। প্রচণ্ড ক্রোধে হৃদয়ের চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল, তাহার দীর্ঘোন্নত দেহ যেন ফুলিয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অবশেষে বজ্রকঠোর স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, তোমাকে কে মেরেছে? দেখিয়ে দাও, তার মুণ্ডুটা আমি ছিঁড়ে আনি।" হৃদয়ের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া দাঁড়ি-মাঝিরা ইতিপূর্ব্বেই নৌকা তুইখানি লইয়া মাঝ গঙ্গায় সরিয়া পড়িয়াছে। ভাগিনেয়ের এই ভীষণ ভাব দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চকিত হইয়া উঠিলেন ও সমস্ত ঘটনা বলিয়া



তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। বিবরণ শুনিয়া হৃদয় হতবুদ্ধি হইয়া মাতুলের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কামারপুকুরে একদিন কাল মেঘের কোলে মালা গাঁথার মত ধবল বলাকাবলি উড়িতে দেখিয়া বালক গদাধর ভাব-তন্ময়তায় কিরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, সে কথা আমরা বলিয়াছি। অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধিলাভ করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বর-দেবোদ্যানে নবীন তৃণাচ্ছন্ন কোন মনোরম স্থানে দাঁড়াইয়া অদ্বৈত-ভাবে তন্ময় হইয়া অনুভব করিতেছিলেন, এই ক্ষেত্র প্রকৃতই তাঁহার অঙ্গীভূত। ঠিক সেই সময় একজন লোককে ঐ তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার বক্ষঃস্থল দলিত করিয়া চলিতেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। ছয় ঘণ্টার পর সেই যন্ত্রণার অবসান হয়।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার হৃদয় জাতীয় আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়া ইস্‌লাম্-সাধনায় আকৃষ্ট হইল। অন্যান্য ধর্ম্মমতের সাধনে সর্ব্বলোকেশ্বর জগৎ-পিতার প্রসন্নতা লাভ করা যায় কি না, ও তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধক জীবন সার্থক করিতে পারেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য এই অদ্ভুত সাধকের চিত্ত সমুৎসুক হইয়া উঠিল। শ্রীভগবান্ কি কেবল হিন্দু-জাতির প্রতি অনুকূল; হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতির মুক্তিকামনা কি আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা? ইহা জানিবার নিমিত্ত তাঁহার অদম্য কৌতূহল জন্মিল। শ্রীরাম-কৃষ্ণের এই ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের অব্যবহিত কারণ এই সময় দক্ষিণেশ্বরে ইস্‌লামী সুফি-সম্প্রদায়ভুক্ত এক সাধকের আগমন।

ইঁহার নাম গোবিন্দ রায়; শ্রীরামকৃষ্ণ ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আল্লামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিতেন, "ঐ সময় হিন্দুর দেব-দেবীকে প্রণাম করা দূরে থাক, দর্শন করিতেও প্রবৃত্তি হত না।" মন্দিরভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি মথুরের বৈঠকখানায় বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের চিত্ত আবার দারুণ আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একে ত পরধর্ম্ম ভয়াবহ! পরলোক ত পরের কথা, বড়লোকের বাড়ীতেই কি এত অত্যাচার সহিবে? এক সুবিধা, হলধারী নাই। অক্ষয়ও ছেলেমানুষ—অতশত বুঝে না। হলধারী কখনই মামার এ অসংযত আচরণের পোষকতা করিতেন না। আর তাঁহাকে দলে পাইলে বাগানের কর্ম্মচারীরা কি যে না করিত, তা ত বলা যায় না। সত্য বটে, মথুরমোহন চিরকালই সহায়তা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তিনিই কি এই সকল যথেচ্ছাচার সহ্য করিতে পারিবেন? মুসলমানদিগের মত কাছাখুলে কাপড় পরা, নেমাজ করা, ঘটী প্রভৃতির পরিবর্ত্তে বদনার ব্যবহার, ওজু করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালন, আর সর্ব্বোপরি বিজাতীয় আহারে দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা—সকলই বিসদৃশ। মাতুলের এ কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল! কিন্তু মথুর সত্য সত্যই সহায় হইলেন। তিনি একজন মুসলমান বাবুর্চ্চি আনাইয়া তাহার নির্দ্দেশ মত ব্রাহ্মণের দ্বারা বাবার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া দিতেন। তিন দিন সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, এক দীর্ঘকায় তেজঃপুঞ্জ শ্মশ্রুল পুরুষ তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান। এই পুরুষপ্রবরের দর্শন লাভ করিয়া, ইস্‌লাম্ সাধনার শেষ হইল। প্রকৃতপক্ষে এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক-জীবনের পরিসমাপ্তি।

১২৬৪ সালে সাধনার যে প্রবল ঝড় উঠিয়াছিল, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সমভাবে প্রবাহিত থাকিয়া ১২৭৬ সালে তাহার অবসান হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স এখন বত্রিশ বৎসর। এই যুগব্যাপী সাধনায় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন ধর্ম্মমত একই স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র। ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, ভক্তি—সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সত্য, তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিলে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণে প্রাণে ব্যাকুল হইলে তিনি দেখা দেন। বলিতেন, "যেমন তুমি আমায় দেখিতেছ, আমি তোমায় দেখিতেছি, এমনি তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়।" কিন্তু বিংশ শতাব্দির এই বৈজ্ঞানিক যুগে অশিক্ষিত এই পাগলের কথায় কে প্রত্যয় করিবে!

(১৩)

সুনিয়ম ও সুশ্রুষায় শ্রীরামকৃষ্ণ ছয় মাসে নিরাময় হইলেন; কিন্তু হৃদয় দেখিল, মাতুলের দেহে পূর্ব্বের মত বলের সঞ্চার হইতেছে না। না হইবারই কথা। বর্ষা আসিয়া পড়িয়াছে; তখন কলের জল ছিল না, গঙ্গার জল লোণা, অপেয় হইয়াছে। মথুরের সহিত পরামর্শ করিয়া হৃদয় মাতুলকে কামারপুকুরে লইয়া গেল। পাছে সেখানকার দরিদ্র-সংসারে কোন-কিছুর জন্য বাবার কষ্ট হয়, মথুরমোহনের গৃহিনী শ্রীমতী জগদম্বাদাসী সলিতা হইতে খড়্‌কেটী পর্য্যন্ত গুছাইয়া সঙ্গে দিলেন। চন্দ্রাদেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমরণ গঙ্গাতীর ত্যাগ করিবেন না। কিন্তু

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখিবার ঔৎসুক্যে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কামারপুকুরে আবার আনন্দের হাট বসিল। সাধনার উৎকট একাগ্রতায় দীর্ঘ আট বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভুমির মুখ দেখেন নাই। এই কয় বৎসরে সেখানে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাহা ছিল, তাহার সব নাই; বালক—কিশোর, নবীন—প্রবীন হইয়াছে; পুরাতনের স্থল নূতন আসিয়া অধিকার করিয়াছে। কেবল পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সরল হৃদয় গ্রামবাসীদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা। প্রীতির ধনকে কাছে পাইয়া তাহারা অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। অগ্রজ রামেশ্বর বধূমাতাকে আনাইবার জন্য জয়রামবাটীতে লোক পাঠাইলেন।

বিবাহের অব্যবহিত পরে বালিকা নব বধূর অঙ্গ হইতে যখন ধার-করা অলঙ্কারসকল খুলিয়া লওয়া হয়, সেই সময় চন্দ্রাদেবী বলিয়াছিলেন, 'গদাই এরপর তোমাকে এর চেয়েও কত ভাল ভাল গয়না দিবেন।' মাতার কথা নিষ্ফল হইল না। গদাই বধূকে যে অলঙ্কার দিলেন, সে ঐশ্বর্য্য অবিনাশী।

বধূর বয়স তখন প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ। পল্লীগ্রামে ইহাও বালিকা-কাল। কেন না, সেখানকার আব-হাওয়ার গুণে এ বয়সে দেহের কৈশোর-পরিণতি ঘটে না; মনের ত নয়ই। কিন্তু বালিকা হইলেও নারী-সাহচর্য্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। অথচ সহধর্ম্মিণীর ঐহিক পারত্রিক সকল কল্যাণই স্বামীর সৎশিক্ষা-দানের উপর নির্ভর করিতেছে। একদিকে শাস্ত্রানুশাসন, অন্য-

দিকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষিণী বধূর প্রতি কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন। এই দ্বন্দ্বস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুবাক্য স্মরণ হইল। শ্রীমৎ তোতাপুরী তাঁহাকে বিবাহিত জানিয়া বলিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টি থাকিবে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে, যোগী ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হন নাই। অতি কঠোর পরীক্ষা! কিন্তু কঠোরতর সংযমী শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবার পাত্র নহেন। যে অলৌকিক প্রেমাগ্নিতে মদন-ভস্ম করিয়া প্রেমিক যোগী মহেশ্বর স্মরহর হইয়াছিলেন, কামারপুকুরের ভিখারী কুটীরে সেই প্রেম-লীলার পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। প্রেমের শিক্ষা যেমন সহজে ফলবতী হয়, তেমন আর কিছুই নয়। অকপট পবিত্র ভালবাসায় বধূর হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার মানসক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বীজ বপন করিলেন, অচিরেই তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর ইহা মনঃপূত হইল না। বধূর সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে পাছে শ্রীরামকৃষ্ণ পথভ্রষ্ট হ'ন্, এই ভয়ে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এ বিষয়ে ত মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলা চলে না। কোন প্রতিকার না পাইয়া ভৈরবীর আহত অভিমান যেন কথায় কথায় ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়! একটা তুচ্ছ আমীষ পাইবামাত্র তাঁহার নিরুদ্ধ ক্রোধ যেন 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠে! কামারপুকুরের ক্ষুদ্র সংসার প্রমাদ গণিল। কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এই অনর্থের সৃষ্টি, তিনি সম্পূর্ণ উদাস। কেবল ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসেন! কিন্তু ক্রমে ভৈরবীর চৈতন্যোদয় হইল। এ কি ভ্রান্তি! যাঁহার পবিত্র সঙ্গে সকল কামনার শান্তি হয়—বহিরন্তর যাঁহার ধবল তুষারস্তূপ অপেক্ষাও

অনাবিল, তাঁহার চিত্তে মালিন্য স্পর্শ করিবার আশঙ্কা! সংসার-সংস্পর্শে আসিয়া কোথা হইতে কোথায় নামিয়া দাঁড়াইয়াছেন ভাবিয়া ভৈরবী শিহরিয়া উঠিলেন। আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। অবশেষে সন্তপ্তা ভৈরবী একদিন সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ-জ্ঞানে স্বহস্ত-রচিত পুষ্প-চন্দনে শ্রীরামকৃষ্ণকে সাজাইয়া, তাঁহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন।

এদিকে হৃদয় দেখিল, পাণ্ডুবর্ণ ত্যাগ করিয়া মাতুলের গণ্ড-যুগল রক্তকমলের ন্যায় রমণীয় আভা ধারণ করিয়াছে। কয়েকদিন নিজ ভবনে একান্তে সেবা করিবার জন্য মাতুলকে সে তাহার জন্মভূমি সিহড়ে লইয়া গেল। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণের মন ভাবের উদ্দীপনায় জীব-জগৎ ছাড়িয়া যখন-তখন সমাধি-রাজ্যে উধাও হইয়া যাইত। এই অদ্ভুত ব্যাপারে ও-অঞ্চলে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, 'দিনে সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে।' হৃদয়ের বাড়ী হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ দুই চারি দিনের জন্য শ্যামবাজারে বেড়াইতে গেলেন। গ্রামখানি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইবার পর যেন হরিভক্তির বন্যা বহিল। সাত দিন সাত রাত কেবল কীর্ত্তন আর নর্ত্তন! সে উন্মাদ নর্ত্তনে মেদিনী টলমল করিতেছে, নাম-তরঙ্গে তরুপত্র দুলিতেছে; শত শত খোলের প্রমত্ত গর্জ্জনে আকাশ কাঁপিতেছে! নামে মাতুয়ারা—নয়নে নয়নে ধারা—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আত্মহারা—মাথার উপর নিদাঘ-সূর্য্য নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন—কাহারও হুঁস নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই!

হৃদয় বড় বিপদে পড়িল। মাতুলের হারা স্বাস্থ্য সবে একটু

ফিরিয়াছে, তার উপর এই অত্যাচার! অপরাহ্ণে আহার, সর্ব্ব-প্রকার বিশ্রামের ব্যাঘাত! পলায়নেও নিস্তার নাই, সঙ্গে সঙ্গে শত খোল তাড়া করিয়া ছুটে—তাকুটি, তাকুটি! অসম্ভব ভিড়ে পাছে মাতুলের সর্দ্দি-গরমী হয়, হৃদয় শিশুটীর মত তাঁহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, সেথাও সেই পিপীলিকার সার, সেই তাকুটি, তাকুটি! হৃদয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। অসহ্য ক্রোধে বলিল, "আমরা কি কখন কীর্ত্তন শুনি নাই?" কে তাহা গ্রাহ্য করে? তাহার রক্তচক্ষু, কুটিল ভ্রূকুটী, সকল উপেক্ষা করিয়া সেই তাকুটি, তাকুটি!

(১৪)

ছয় মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন। তখন শীতের প্রারম্ভ। মাঘ মাসে হৃদয় ও বাবাকে লইয়া মথুর সপরিবারে মহা সমারোহে তীর্থযাত্রা করিলেন।

পথে বৈদ্যনাথ। দেবদর্শন করিয়া দুই-একদিন বিশ্রাম করিবার পর বারাণসী যাত্রা করা হইবে। এখানে বাবা দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম—কিন্তু দৈন্যের এ কি নিদারুণ চিত্র! রুক্ষ্ম কেশ, মলিন বেশ, শুষ্ক চর্ম্ম, জীর্ণ, শীর্ণ, কঙ্কালসার মূর্ত্তিসকল যেন বুভুক্ষার অবয়বী ছবি! বাবার বুক ফাটিয়া চোখে জল ছুটিল। মথুরকে বলিলেন, "এদের একদিন পেটভরে খেতে দাও, মাথায় একমাথা তেল দাও, পরতে একখানি করে কাপড় দাও।"

মথুর বিষয়ী লোক। বুঝিতেন যে, পৃথিবীতে যত দৈন্য আছে,

সব দূর করিতে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হইয়া যায়। দারিদ্র্য দেখিলেই যদি থলির মুখ খুলিতে হয়, বিষয় কয় দিন থাকে? বলিলেন, "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এতগুলি লোককে অন্নবস্ত্র দিতে গেলে যদি টাকার অনটন হয়, তাই ভাব্‌ছি।"

"তবে রইল তোর কাশী! এদের কেউ নেই, আমি এদেরই সঙ্গে থাক্‌ব—" বলিয়া বাবা সেই দরিদ্রদিগের মাঝে গিয়া বসিলেন।

মথুর বিলক্ষণ জানিতেন, বৈদ্যনাথের অচল শিবলিঙ্গ যদি সচল হইয়া এখানে আসিয়া বাবাকে সাধ্য-সাধনা করেন, তথাপি সত্য-নিষ্ঠ বাবার মুখের বাক্য স্খলিত হইবে না। কর্ম্মকুশল মথুর তৎক্ষণাৎ সব বন্দোবস্ত করিলেন। একদিনের জন্য সে অন্নহীন পল্লী অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রে পরিণত হইল। দরিদ্রগণের মধ্য হইতে বাবাকে উদ্ধার করিয়া মথুর পরমানন্দে কাশীযাত্রা করিলেন।

শিব-ধন্য কাশী! স্বর্ণময়ী পুরী! কিন্তু হায়, বিশ্বনাথের এই মুক্তিক্ষেত্রে, অন্নপূর্ণার অন্নছত্রে, দণ্ডপানি কালভৈরব-রক্ষিত, ত্র্যম্বকের ত্রিশূলাগ্রে অবস্থিত, পতিত-পাবনী মন্দাকিনী অঙ্ক-সায়িত, ত্রিতাপহারী এই পবিত্র ভূমে—যেখানে জন্মার্জ্জিত পাপক্ষয়, মরিলে শিবত্ব প্রাপ্তি হয়—সেই মহাতীর্থে নিরন্তর বোম বোম হর হর' রব অন্নপূর্ণার স্তুতি-স্তব, শঙ্খ-ঘণ্টারোলের সঙ্গে সঙ্গে কাম-কাঞ্চনের অবিরাম উদ্দাম কোলাহল উঠিতেছে; সেই চাতুরি, গলায় ছুরি, পরস্পর প্রতারণা, রণারণি হানাহানি! যে রাজ্যে রাজরাজেশ্বর বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণশীর মন্দির মাথা তুলিয়াছে, তাহারই তলে তলে গুপ্ত পাপ আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়াছে!

আহত শিশুর মত শ্রীরামকৃষ্ণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "আমাকে হেথায় কেন আন্‌লি, মা, আমি যে সেখানে এর চেয়ে ভাল ছিলাম।"

গঙ্গা-তরঙ্গ-মালিনী বারাণসীর রমণীর তট-শোভা ভাগীরথী-বক্ষ হইতে অতীব মনোলোভা। মনে হয়, এই পবিত্র পুরি যেন জাহ্নবীর পূতবারি হইতে অর্দ্ধ চক্রাকারে ক্রমোর্দ্ধে উঠিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল শূল-কণ্টকিত উন্নতশীর মন্দির! নৌকার উপর হইতে মথুরমোহন ও হৃদয়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ এই মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। গঙ্গাবক্ষ-সঞ্চারিণী তরণী ধীরে ধীরে মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিতায় চিতায় লম্বমান শব—আহুতি পাইয়া অনল যেন সচঞ্চল শত শিখা বিস্তার করিয়া খল খল হাসিতেছে! অগ্নিকণার সহিত উদ্গারিত ধূমরাশি আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া শূন্যে উঠিতেছে। ভাবাবেশে টলিতে টলিতে স্খলিতপদে শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে নৌকার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাঝিরা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ধর ধর।' মথুর ও হৃদয় সশঙ্কিত চিত্তে সতর্ক হইয়া রহিল। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া স্থির নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, চিতাভস্ম-ভূষিত, জটাজুট-মণ্ডিত, রজতগিরি সদৃশ দীর্ঘকায় এক দিগম্বর পুরুষ চিতায় চিতায় গমন করিয়া প্রতি শবের কর্ণে পরম মন্ত্র দান করিতেছেন। শবের মুখে দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শশিশেখরা, মহামেঘ-ঘোরা, গলিত-কুন্তলা এক দিগম্বরী নারী তাহার সংসার-বন্ধন মোচন করিয়া মুক্তি-পথে প্রেরণ করিতেছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া মানুষ

আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কাম-কাঞ্চন-ভোগে গভীর হইতে গভীরতর কূপে ডুবিতেছে। কিন্তু সত্যবদ্ধ বিশ্বনাথ আপনার সত্যরক্ষা করিয়া মুক্তিক্ষেত্র বারাণসীর মাহাত্ম্য প্রকট করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় সপ্তাহ অতীত হইল। মথুর বাবাকে লইয়া প্রয়াগে গেলেন এবং তথায় ত্রিরাত্রি বাস করিয়া, পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় একপক্ষকাল যাপন করিলেন। আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা ভৈরবী-ব্রাহ্মণী কাশীবাস করিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আগমন-বার্ত্তা পাইয়া সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তারপর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার আয়োজন দেখিয়া তিনিও দুর্লভ সঙ্গে প্রেমতীর্থ দর্শনের সুযোগ ছাড়িলেন না।

ভাবুকের ভাবরাজ্য শ্রীবৃন্দাবন! ভক্তের চিরপ্রেম-নিকেতন! যেখানে বনের পাখী প্রেম-গাথা গায়, প্রেমের পুলকে শিখি নাচে। বাঁশের বাঁশী বাজাইয়া রাখালবালক এখনও গোধন চারণ করে। শতাব্দির পর শতাব্দি চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ব্রজের জীবনধারা এখনও তেমনি প্রবাহিত। সে মনোমোহন ভাব, চিত্ত-বিনোদ সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে হয়, কালের প্রভাব এখানে নাই। নিবিড় শ্যামাচ্ছন্ন ধরাতল; নীল তমালদল বায়ুহিল্লোলে দুলিতেছে; স্বচ্ছন্দ চিত্তে হরিণ-হরিণী খেলিয়া বেড়াইতেছে। সেই যমুনা—গলিত নীলমণির ন্যায় যার নীল নীর, আমোদিনী ব্রহ্মরাণীর শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে আজিও সুরভিত—সেই কৃষ্ণকেলী-কুতূহলা আতটপূর্ণা যমুনা—কৃষ্ণপ্রেমে বিভোরা, তরঙ্গ তুলিয়া তেমনি নাচিয়া চলিয়াছে। কূলে কূলে তেমনি গোস্পদ-চিহ্ন। কিন্তু সে রাখালরাজ কোথায়? শ্রীরামকৃষ্ণ অধীর হইয়া ফুকারিয়া

কাঁদিয়া উঠিলেন, “হায়, সকলই সেই আছে, কৃষ্ণরে, কেবল তোকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি নি।”

কৃষ্ণের স্মৃতি নাই, ব্রজে এমন স্থান কোথায়? পবিত্র পবন এখনও যেন কৃষ্ণ-গাত্র গন্ধে বিভোর! হেথা তমালকুঞ্জ, হোথা কদম্ববন কৃষ্ণ-স্মৃতি উদ্দীপন করিতেছে। বৃক্ষ বল্লীগণ তরতর ঝরঝর মর্ম্মরে পরস্পরে কৃষ্ণকথা কহিতেছে। কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমরা হরিগুণ-গুঞ্জনে মত্ত। গোপ-গোপিণীর পবিত্র পদ-স্পর্শপূত রজ এখনও কৃষ্ণ-স্মৃতি বক্ষে বহন করিতেছে। সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র। সেই পবিত্র রজে লুটাইয়া, কৃষ্ণ বিরহে আকুল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, “ব্রজে সকলই সুন্দর, কেবল আমার ব্রজসুন্দর নাই।”

একদিন সন্ধ্যার সময় যমুনা-তীরে যাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, গোধূলি সমাগমে রাখালগণ গোধনসহ যমুনা পার হইয়া ফিরিতেছে। হৃদয় সঙ্গে ছিল, তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, এমনি সময় গোধন লইয়া রাখাল সঙ্গে রাখালরাজ নিত্য গোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিতেন। হায়, আজ তিনি কোথায়? বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ নিস্তব্ধ, নয়ন নিষ্পন্দ হইয়া গেল। দুই চক্ষু দিয়া মুখ বুক ভাসাইয়া অবিরল প্রেমধারা বহিতে লাগিল। সহসা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুল শ্রবণে দূর বংশীধ্বনি বাজিয়া উঠিল। যমুনার পরপারে নিবদ্ধদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন, মুরলী-চালিত গোধন ধীরে ধীরে যমুনা পার হইতেছে। পশ্চাতে আরও দূরে সু-উচ্চ শিখিপুচ্ছ হেলিতেছে, খেলিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে, রাখালরাজকে সঙ্গে লইয়া রাখালবালকগণ আনন্দ কোলাহল তুলিয়া

আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে কালোরূপে সন্ধ্যাসমাচ্ছন্ন যমুনা-কূল আলোকিত হইয়া উঠিল। হৃদয় দেখিল, মাতুলের মন কোন্ অজানালোকে প্রয়াণ করিয়াছে।

ঘন ঘন ভাব-সমাধি, কখন 'হা কৃষ্ণ-যো কৃষ্ণ', কখন 'মা-মা' করিয়া বুক-ফাটা রোদন অলৌকিক হইলেও, অজানারাজ্যের এইরূপ কতকগুলি অদ্ভুত ব্যাপারে হৃদয় ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মাতুল আজ নিধূবনে যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, সহজ বুদ্ধিতে সে তাহার কোন কূল-কিনারা করিতে পারিল না। ভাবে বিহ্বল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিধূবন দর্শন করিতেছিলেন, সহসা নিকটস্থ কুটীর হইতে এক বর্ষীয়সী মহিলা ভাবাবিষ্ট হইয়া 'দুলালী-দুলালী' বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে আসিয়া মাতুলকে দৃঢ় বাহুপাশে বদ্ধ করিল—যেন কতকালের চেনা আপনার লোক! তারপর ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পরস্পরে সে কত কথা, কত মধুর সম্ভাষণ! হৃদয় তাহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিল না। ভয়ে তাহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। কে ইনি? তাহার সরল শিশু-স্বভাব মাতুলকে যখন যিনি ধরেন, একেবারে বাঘের মতন ধরেন। নিধূবনের এ বাঘিনীর কবল হইতে মাতুলকে মুক্ত করা ত সহজ হইবে না! কে ইনি? অনুসন্ধানে যাহা শুনিল, তাহাতে তাহার বুক শুকাইয়া গেল। হৃদয় শুনিল, এই বৃদ্ধা—গঙ্গামায়ী, বহুকাল হইতে ব্রজবাসিনী, জনৈকা সিদ্ধপ্রেমিকা। জনশ্রুতি বলিল, ইনি শ্রীললিতাদেবী—শ্রীমতীর প্রধানা সঙ্গিনী—জীবকে প্রেমশিক্ষা দিবার নিমিত্ত আবার ব্রজমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'দুলালী' ব্রজেশ্বরীর নাম। তবে

এখানেও আবার প্রেমতরঙ্গ ছুটিবে, অশ্রুতরঙ্গ বহিবে! মাতুলের সেই মধুর-ভাব-সাধন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে যেমন বন্যা বহিয়াছিল! সেই 'প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন'—'হা কৃষ্ণ, যো কৃষ্ণ, দেহকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, মনকৃষ্ণ, আত্মাকৃষ্ণ' রবে সেখানকার শাখী-পাখী যেমন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল! হৃদয়ের অনুমান মিথ্যা হইল না। দুই ভক্তের নিত্য মিলনে গঙ্গামায়ীর তৃণ-লতা-সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটীর কৃষ্ণ-প্রসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

মথুরমোহন বলিলেন, "হৃদু তাল সাম্‌লাও। যেমন করে পার, এ বুড়ীর হাত থেকে বাবাকে উদ্ধার করে নিয়ে চল।" কিন্তু গঙ্গামায়ীকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরিতে চাহিলেন না। সেখানে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, কাম-কাঞ্চন প্রসঙ্গ। বাবা দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আমি আর এখান থেকে যাব না।" হৃদয় বলিল, "যাবে না? তুমি পেট-রোগা লোক, অসুখ করলে দেখ্‌বে কে?" গঙ্গামায়ী বলিলেন, "কেন? আমি দেখ্‌ব; আমি দুলালীর সেবা করব," বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহার প্রেমাস্পদের হাত ধরিলেন।

ও বাবা, বুড়ী ত কম নয়! যেন দুলালীতে ওঁর দলীলী সত্ত্ব! কিন্তু হৃদয়ও ছাড়িবার পাত্র নহে; দখল যে দাবীর পনের আনা প্রমাণ, সে তাহা বুঝিত। সেও মাতুলের অপর হাত ধরিয়া বলিল, "মামাকে আমিও ছেড়ে যাব না।" তারপর দুজনে দুহাত ধরে দুদিকে টানাটানি! শ্রীরামকৃষ্ণ বড় বিপদে ঠেকিলেন। এক দিকে গঙ্গামায়ীর আকুল অশ্রুপাত, অন্যদিকে তাঁহার চির প্রীতিভাজন ভাগিনেয়ের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক বীরমূর্ত্তি। এই সময় তাঁহার মনে

পড়িল, তাঁহার চিরদুঃখিনী মা দক্ষিণেশ্বরে সেই নহবতের ঘরে প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। মায়ের বার্দ্ধক্যে তাঁহার সেবা-সুশ্রুষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গামায়ীর সকল অনুনয় ব্যর্থ হইল। মথুর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন ও বাবাকে লইয়া যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণেশ্বরে ফিরিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিবার পর সংবাদ আসিল, কাশী-বাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর দিব্যলোক প্রাপ্তি হইয়াছে।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড হইতে আনিত রজ পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "আজ থেকে এস্থান বৃন্দাবনতুল্য হল।" এই শ্রীবৃন্দাবন-সদৃশ স্থলে বাবার আদেশে বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া অকাতর ব্যয়ে মথুর মহোৎসব করিলেন। 'দিয়তাং ভোজ্যতাং' শব্দের সঙ্গে তীর্থযাত্রার পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "প্রয়াগে গিয়ে দেখলাম, সেই পুকুর, সেই দুর্ব্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা! কেবল তফাৎ পশ্চিমে লোকের ভুষির মত মল। তবে, ভগবৎ-প্রেম উদ্দীপনের জন্য তীর্থদর্শন দরকার।" কিন্তু কোথায় সে ভাব, কোথায় সে উদ্দীপন? সকল তীর্থই এখন নির্জীব। প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা কোথাও নাই, ধর্ম্মের উদার-বুদ্ধি সর্ব্বত্র বিরল। আছে কেবল একটা ঠাট-খাড়া, কেবল গোঁড়ামী আর মতুয়ার বুদ্ধি। কলিকাতার সন্নিকটে কালীঘাট দেবীপীঠ—সাক্ষাৎ জগজ্জননী যথায় বিরাজিতা—সেখানে তান্ত্রিকতার অছিলায় কারণপানের ভানে মদের তুফান বহে, সাধনার ভানে পাশবাচার। পবিত্র বারাণসী—কুমারযোগী

শ্রীশঙ্করের তীর্থে দণ্ডধারী উদাসীগণ নাম, যশ, প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন—তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তীর্থে যোষিৎসঙ্গে প্রেমপ্রসঙ্গে ব্রজলীলার অভিনয় হইতেছে। তার উপর আবার সর্ব্বত্রই ধর্ম্মদ্বন্দ্ব। শৈব—বৈষ্ণব বিরোধী। বৈষ্ণব বলেন, মহাশক্তিই হ'ন, আর যিনিই হ'ন, পারের কর্ণধার একমাত্র নারায়ণ। উত্তরে শক্তি বলেন, 'সে ত ঠিক কথা! মা —রাজরাজেশ্বরী, তিনি কি আর নৌকোর হাল ধরবেন? তার জন্যে ঐ কেষ্টাকেই রেখে দিয়েছেন।' জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—ধর্ম্মের নানা মত, নানা পথ—দুর্ব্বল মানব-বুদ্ধিকে দিশাহারা করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন, দীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী বহু সাধনায় যে উদার সত্য তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছে, ধর্ম্মের এই মহাগ্লানির দিনেই তাহা প্রচার করিবার প্রকৃত সময়। কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম সংসারারণ্যে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাহারা নির্গমের নানা মত—নানা পথের জটিলতায় সংশয়াতঙ্কে আকুল হইয়াছে, তাহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে যে, মত—পথ মাত্র। ত্যাগ-বৈরাগ্য, প্রেম-ভক্তি, বিবেক-বিশ্বাস, সারল্য ও সত্যনিষ্ঠা ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়। শ্রীশ্রীজগজ্জননীর অপার কৃপায় তিনি জানিয়াছেন যে, পুণ্যবতী রাণী রাসমণির অশেষ সুকৃতি-ফলে, দক্ষিণেশ্বরের এই দেবস্থলে ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য জানিবার, বুঝিবার ও প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কত ভাবের কত ভক্ত-সমাগম হইবে। মথুর এই কথা শুনিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "তারা সব কবে আসবে, বাবা?" বাবা উত্তর দিলেন, "সে মা-ই জানে!"

কিন্তু মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইলেও ভক্ত-সঙ্গ লাভের ব্যাকুলতায় বৈঠক্‌খানা-কুঠির ছাদে উঠিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কাতর কণ্ঠে ডাকিতেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! গৃহীদের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার ঠোঁট জ্বলে গেল।"

---

(১৫)

মথুর হিসাবী লোক। ব্যয় সম্বন্ধে বদ্ধ-মুষ্টি। কিন্তু বাবার বেলায় মুক্ত-হস্ত। বাবা বলেন, 'বড়মানুষদের জানা উচিত যে, তারা ভগবানের ভাণ্ডারী।' কিন্তু ভাণ্ডার ত আর লুটিয়ে দেওয়া যায় না। তবে, বাবার সম্বন্ধে আলাদা কথা। মথুরের যা-কিছু আছে, সবই ত বাবার।

বাবাকে মনের মত বহুমূল্য সাজগোজ পরাইয়া মথুর যাত্রা বা কীর্ত্তনের আসরে বসাইয়াছেন। পেলা দিবার জন্য সামনে সারি দিয়া শত শত মুদ্রা সাজাইয়া দিয়াছেন। মথুর জানিতেন, দীন-দরিদ্রের ঘরে জন্ম হইলেও বাবার মেজাজ দানশীলতায় কল্পতরুর ন্যায় উদার। সঞ্চয়-বুদ্ধি-বিহীন নহিলে কি অমন করিয়া দান করিতে পারে! কীর্ত্তন বা যাত্রা শুনিতে শুনিতে ভাবে বিভোর হইয়া বাবা এককালীন সম্মুখস্থ সমস্ত অর্থ পেলা দিয়া বসিলেন! মথুর আবার টাকা আনিতে পাঠাইলেন। 'সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিলে হে লুটিয়ে দিলে'—আশ-পাশের লোক কানাকানি, চোখ ঠারাঠারি করে। সুধু কি এই! সাধু-সেবার জন্য বাবার হুকুমে দক্ষিণেশ্বরে স্বতন্ত্র ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। গাড়ী, পালকী বাবা যাকে যা

দিতে বলেন, বাবুর মুখে দ্বিরুক্তি নাই। কেন রে বাপু? এত কেন? সোণার বাসনে খাওয়ানো, সোণার আল্‌বোলায় তামাক! ভোগের চূড়ান্ত করে নিলে হে, চুটিয়ে! বরাত! বরাত! ইনি আবার ত্যাগী! তুমি যেমন! ঐ যে ভাব দেখায়, সোণার বাসন-টাসন্‌গুল গ্রাহ্যই করে না—ওটা একটা প্রকাণ্ড চাল! বুঝলে? যখন ঐ হৃদেটাকে ঠেকিয়ে দিয়ে সব আদায় করে নেবে, তখন বাবুর চৈতন্য হবে।

কিন্তু হৃদয়ও কোনকালে সে সব আদায় করিল না, আর বাবুরও সে চৈতন্য হইল না। উৎকৃষ্ট জরি-বারাণসীর সাজে সাজাইয়া মথুর দেখিয়াছেন, কিছুক্ষণ গায় দিবার পর বাবা থু থু করিয়া সব পরিত্যাগ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ কাশ্মীরী শাল বাবার গায় জড়াইয়া দিয়াছেন, সে শাল বাবার পদ-দলিত হইয়াছে। বিশিষ্ট আয়ের সম্পত্তি বাবার নামে লিখিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া মথুর লাঞ্ছিত হইয়াছেন; 'আমায় বিষয়ী করতে চাস' বলে বাবা তাঁহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করিয়াছেন! কাম-কাঞ্চন-ভোগী বিষয়ী মথুর বুঝিতেন যে, যাহারা ভোগের আস্বাদ কখন পায় নাই, অথবা অতিভোগে যাহাদের ভোগ তিক্ত হইয়াছে, কিম্বা আত্মরক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা কাম-কাঞ্চনের কোলাহল হইতে বহুদূরে বাস করেন, তাঁহাদের ত্যাগ—ত্যাগমাত্র। কিন্তু কাম-কাঞ্চনের মাঝখানে বসিয়া যিনি বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত, ভোগের আস্বাদ পাইয়াও যিনি ত্যাগী, তিনিই প্রকৃত বিরাগী। তিনি দেবতা হইতেও উচ্চ। কেন না, দেবশরীর—ভোগ-শরীর। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ করিয়া বাসনার স্বর্গভোগের জন্যই দেব-দেহের

সৃষ্টি। স্বর্গ কিম্বা অন্য ধাতু স্পর্শ করিতে যাঁহার শরীর কুঞ্চিত, বস্ত্রে বা রজ্জুতে গ্রন্থি দিতে শ্বাসরোধ হয়, সেই কাম-কাঞ্চন-বিমুখ, বিষয়-সুখ-পরাঙ্মুখ মহাপুরুষের সঙ্গে কোন্ দেবতার তুলনা হইবে? তাই, কায়-মন-বাক্যে বাবার সেবা ভিন্ন মথুরের অন্য সাধনা ছিল না। তাই, তীর্থ হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে হৃদয়ের যখন স্ত্রী-বিয়োগ হইল এবং সাময়িক বৈরাগ্যের উন্মেষে সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলে তাহার ভাবাবেশ হইতে লাগিল, মথুর তখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আমরা নন্দী-ভৃঙ্গীর মত বাবার কাছে থাক্‌ব, সেবা কর্‌ব, আমাদের ও-সব কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর দেখিতে দেখিতে তিনটী বৎসর অতীত হইয়া গেল। তপনদেবকে তিনবার নিঃশব্দে প্রদক্ষিণ করিয়া জীবজননী মেদিনী চতুর্থের পথে যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড় সকল মানবেরই অদৃষ্ট-চক্র ঘুরিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তৎস্থলে রামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ক্রমে আরও কয়েকমাস কাটিয়া গেল! শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত-সেবক মথুর চতুর্দ্দশ বৎসরের সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া দিব্যরথে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দিব্যভাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এক ধারাতেই বহিতে লাগিল। সেই ভগবৎ-প্রসঙ্গ, ভাবতরঙ্গ কখন 'হরি-হরি', কখন 'কালী-কালী', কখন 'আল্লা-আল্লা' বলিয়া নৃত্য, অশ্রুপাত, ভাব-সমাধি।

চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন জয়রামবাটী-অঞ্চলে বেড়াইতে যান, তাঁহার খোলা-ভোলা উদাসভাব দেখিয়া অনেকেই

ভাবিয়াছিল, ইনি উন্মাদ। উন্মাদ বৈ কি? রাজোচিত বৈভব-শালী মথুরের ন্যায় মহা মহীরুহের ছায়ায় দীর্ঘকাল বাস করিয়াও যিনি একটা ফলও আহরণ করিতে পারিলেন না; কুবেরের ভাণ্ডার করতলে পাইয়াও যাঁহার সংসারের দারিদ্র্য ঘুচিল না; বিবাহ করিয়াছেন, বধূ রহিয়াছে, তাহাকে স্থিতি করিবার কোন চেষ্টা নাই। এক রতি সোণা ত এ পর্য্যন্ত আর অঙ্গে উঠিল না। আর কবে দিবেন, কবেই বা ভোগ করিবে? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এখন আর বালিকাটী নাই, বয়স্থা হয়েছে, দশের পিঠে আট আঠারয় পড়েছে, ভোগ-সুখের বয়স ত এই! 'জমিন-জরু-রূপেয়া' —এই তিনটেকেই যে উপেক্ষা করে, সে সুধু পাগল নয়, তার আগাগোড়াই গোল।

কল্পনার এই সকল জল্পনা শুনিতে শুনিতে শান্ত, সরল-স্বভাবা বধূর মনে মাঝে মাঝে আতঙ্কের ছায়া পড়ে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই তরুণ বয়সে—জীবনের সেই প্রথম উন্মেষে বালিকা বধূর চিত্তমুকুরে যে অভিরাম মূর্ত্তির উজ্জ্বল রশ্মিপাত হইয়াছিল, তাহা উদিত হয়। আহা, সেই তিনি পাগল! সেই আপন-ভোলা দিগম্বর—হরিপ্রেমে গর্গর মাতুয়ারা, বঙ্কিম নয়নদুটীতে অজস্র প্রেমধারা, অধরে ভুবনমোহন হাসি—যার মিষ্ট কথায় সকল ব্যথা দূর হয়, সেই স্বামী পাগল! পাগল কি এমন ভালবাসিতে জানে, এমন প্রাণের টানে কাছে আনে? আমি কত পুণ্যফলে তাঁর পদ-সেবার অধিকার পাইয়াছি! কিন্তু দাসীকে সে অধিকার দিয়াও এখনও ত স্মরণ করিলেন না! আমি কিছুই চাই না, কিছুই —কিছুই চাই না, তবে কেন তাঁর কাছে যাইতে পাই না?

সত্যই কি তাঁর ভাবান্তর ঘটিয়াছে? এমনও ত হয়! হতেও ত পারে! শুক—পাগল, শ্রীচৈতন্য—পাগল, শিব—পাগল! ধর্ম্মোন্মাদ! তা হলে ত তাঁর সেবা করবার জন্য আমার যাওয়া উচিত! বধূ মনে মনে স্থির করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

সেইরূপই হইল। ফাল্গুন মাসে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্ম-তিথিতে বঙ্গের সুদূর গঙ্গাহীন স্থানসমূহ হইতে অনেকেই কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করিতে আসেন। সেই উপলক্ষে বধূ পিতৃসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথে তাঁহার জ্বর হইল। দক্ষিণেশ্বরে যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখনও তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে, কঠিনতম পরীক্ষার দিন সন্নিকট হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে বধূর থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ ও পীড়ার চিকিৎসা প্রয়োজন। জননী বৃদ্ধা হইয়াছেন, রুগ্নার সাহচার্য্যে তাঁহার অসুবিধা হওয়াই সম্ভব। তার উপর যে ঘরে মা থাকেন, সে নহবতের ঘরও রোগীর পক্ষে বাসোপযোগী নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ কক্ষে স্বতন্ত্র শয্যায় বধূকে স্থান দিলেন। তারপর ঔষধ-পথ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, "আর কি আমার সেজবাবু আছে যে, তোমার যত্ন হবে।"

কিন্তু যত্নের কোন ত্রুটি হইল না এবং বধূর নিরাময় হইতেও সময় লাগিল না। স্বাস্থ্যলাভের পর শ্বশ্রূ ও স্বামীর সেবায় বধূর দিনগুলি যেন এক অখণ্ড আনন্দধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দিনে দিনে বধূর হৃদয় দিব্যানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সে কি অপূর্ব্ব ভাব! সারা রাত ভগবৎ-প্রসঙ্গ—হাসির সঙ্গে অশ্রুর তরঙ্গ, কখন কখন গভীর সমাধি! শ্রীমন্দিরে মঙ্গলারতির সঙ্গে সঙ্গে ঊষার আলোক ফুটে, পাখীর কলরব উঠে, তথাপি সে মহাভাব-মগ্ন, মহাকাশে উড্ডীন মন চেতন-জগতে ফিরিয়া আসে না। সে নিবাত-নিষ্কম্প আলোক-শিখার ন্যায় স্থির, পুলক-কণ্টকিত রোমাঞ্চিত কলেবর; অপূর্ব্ব প্রেম-প্রভায় ঝলমল শ্রীমুখ কমল; দিব্যদীপ্তি-সমুজ্জ্বল অর্দ্ধ-নিমীলিত নিস্পন্দ নেত্রদ্বয় দেখিতে দেখিতে বধূর হৃদয় আনন্দ, উদ্বেগ, আতঙ্কে দুরুদুরু কাঁপিতে থাকে—আর কি দেবতা 'তুমি আমি'র লৌকিক জগতে ফিরিয়া আসিবেন না?

এমনি করিয়া প্রায় আটমাস কাটিয়া গেল। একরাত্রে শ্রীরাম-কৃষ্ণের শয্যাপাশে বধূ অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অর্দ্ধ জগৎ ঘুমঘোরে অচেতন। কোনখানে স্বপ্নময়ী বিভীষিকা সুপ্তির শান্তিভঙ্গ করিতেছে; কোথাও সুযোগ-প্রয়াসী পাপ প্রেতের ন্যায় সতর্ক পদে শিকার খুঁজিতেছে; কোথাও নিষ্ফল আক্রোশ, অতৃপ্ত রোষ দাঁতে দাঁত পিশিতেছে; কোথাও জিঘাংসা, কোথাও কাম-তৃষ্ণা জাগাইয়া নিশা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; মাথার উপর নির্ব্বাক্ নক্ষত্রদল নগণ্য মানবের এই জঘন্য আচরণ দর্শনে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আছে।

কিন্তু দক্ষিণেশ্বর-দেবোদ্যানে সর্ব্বত্র প্রশান্ত শান্তি। কেবল গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে তরুপত্রের তরতর ঝরঝর, ঝিল্লির ঝিম্ ঝিম্ শব্দ নিস্তব্ধ উদ্যানখানিকে যেন কোন অতীন্দ্রিয় লোকের স্বপ্নগাথা শুনাইতেছে। এই সময় আমাদের আত্মারাম

পুরুষ কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি অতীন্দ্রিয় লোক হইতে নামিয়া আসিয়া নিদ্রিতা বধূর উপর নিপতিত হইল। মন বলিল, এই দেখ নারীদেহ। ইহারই মোহে জগৎসংসার মুগ্ধ—লুব্ধ। তোমার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়? এই নশ্বর সুখ, না, ঈশ্বরানন্দ? অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত তলাইয়া দেখ, কোথাও কোন কামনা লুকাইয়া আছে কি না? যদি থাকে, তবে চরিতার্থ কর। কিন্তু বধূর দেহ স্পর্শ করিবার নিমিত্ত কর-প্রসারণ করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতলে তলাইয়া গেলেন। সে রাত্রিতে আর তিনি চেতন জগতে ফিরিয়া আসিলেন না।

এই আত্মপরীক্ষায় শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার অভয় বরে তাঁহার মন এখন কামিনী-কাঞ্চনের ভুবনমোহিনী মায়া হইতে চির নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দিব্যভাবে, দিব্যানন্দে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! বুঝিলেন, পার্থিব জননী যেমন চলিবার সময় পদক্ষেপে-অপটু শিশুর হাত ধরিয়া থাকেন, জগতের জগদ্ধাত্রি তেমনি তাঁহার হাত ধরিয়া আছেন, পদস্খলন বা বিপথে গমন করিবার আশঙ্কা আর তাঁহার নাই। বাস্তবিক স্পর্শমাত্রে লজ্জাবতীলতা যেমন সঙ্কুচিতা হইয়া যায়, কাম-কাঞ্চন-সংস্পর্শে এই অদ্ভুত সংযমীর দেহ, মন, ইন্দ্রিয়গণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তেমনি কুঞ্চিত হইয়া যাইত। স্বাস্থ্য, সমাজ ও ধর্ম্মভয় যে সংযমের প্রতিষ্ঠাতা, করধৃত কাঁচা পারার মত তাহা চির চঞ্চল। কিন্তু ভোগের যেখানে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার সেইখানেই ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য। নারীমাত্রে মাতৃজ্ঞান ভিন্ন এরূপ অলৌকিক সংযম কখন সম্ভবপর হয় না।

এক সময় পদসেবা করিতে করিতে বধূ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বোধ হয়?" তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে, যে মা নহবতের ঘরে, তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন।"

বধূ দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পর এক বৎসরের অধিককাল অতীত হইয়া গেল। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল। বৃক্ষ-বল্লীসকল ফলভারে অবনত। ফলের এই প্রাচুর্য্য সময়ে কর্ম্মফলহারিণী কালিকাদেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। আজ নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে সেই পূজার আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু প্রতিমা—সজীব, মানবী। তিমির-অঞ্চলা অমানিশা ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া যখন নিশাভাগে উপনীত হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ পূজকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া পত্নীকে স্বতন্ত্র পীঠে স্বীয় দক্ষিণ-ভাগে বসাইলেন। অভিষেকান্তে পূজা আরম্ভ হইল। বধূ ক্রমে দিব্যভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। অবশেষে পূজা সাঙ্গ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার সহিত দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনার ফল, জপমালা, প্রভৃতি দেবীর পাদপদ্মে বিসর্জ্জন দিয়া প্রণাম করিলেন।

কাম-কাঞ্চন-বিরাগী এই লোকোত্তর পুরুষের পবিত্র জীবন-বেদ আলোচনা করিলে অন্তরে স্বতঃই প্রতিভাত হয় যে, ইঁহার জন্ম, কর্ম্ম এবং জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য—লোকহিতানুষ্ঠান। ধর্ম্মজগতে যখনই বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই এমনি এক আলোক-সামান্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। যখনই উগ্র আসুরিক প্রকৃতি বলবতী হইয়া নিরীহ দেব-প্রকৃতিকে বিধ্বস্ত করে, যখনই নির্যাতন-নিপীড়িত দীন-হীনের কাতর ক্রন্দনে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর হৃদয়

বিদীর্ণ হয়, পাপ-তাপ-দগ্ধ বসুন্ধরার আকুল আহ্বানে তখনই এমনি এক পতিতপাবন পুরুষ লোকশিক্ষকরূপে আবির্ভূত হ'ন; কাম-কাঞ্চন-মুগ্ধ, ভোগলুব্ধ মানব যখন জটিল সংসারারণ্যে জীবনের পথ হারাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে নির্গম অন্বেষণ করে, তখনই অভয়দাতারূপে এমনি এক পথ-প্রদর্শক দেখা দেন। ইঁহাদের পুণ্য-দর্শন জন্ম জন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিভার দূর করে; ইঁহাদের পূত স্পর্শে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত হইয়া বিষবৃক্ষে অমৃতফল ফলে। ধর্ম্মরাজ্যের রাজরাজেশ্বর হইয়াও ইঁহারা অমৃত-বিতরণের জন্য দীন-হীনের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান। ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, দয়া, ভক্তি, বিশ্বাস, সারল্য ও সত্য-নিষ্ঠার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ-স্বরূপ এই সকল আধিকারিক পুরুষদিগের চরিত্র আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ মানবের ন্যায় জন্ম-জরা-মৃত্যুর অধীন হইয়াও মনুষ্য-শরীরে ইঁহারা দেবতার দেবতা। অলকার ঐশ্বর্য্য, অমরা-ঈপ্সিত অপ্সরা, পারিজাতের বিলাস, সোম-সুধার উল্লাস উপেক্ষা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় একমাত্র অলোকসামান্য পুরুষই কেবল বলিতে পারেন—

"কোটী পরশমণি থাকয়ে সম্মুখে,
চিতাভস্ম সমান গণনা করি তাকে।
তিলোত্তমা রমা রম্ভা মন যদি ছলে,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মম মন নাহি টলে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

(শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও সম্পূর্ণ জীবনচরিত ইতিপূর্ব্বে একখণ্ডে আর প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাখ্যাকার—শ্রীশশিভূষণ ঘোষ। মূল্য আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা ৫০৪।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে—"একখানি শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণ স্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাকবে। প্রধান লক্ষ্য থাকবে তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া, তাঁর জীবনীটি তারই উদাহরণ স্বরূপে হবে।"

স্বামিজীর সেই মহতী ইচ্ছা পূর্ণ করিবার আশায় ব্যাখ্যাকার উক্ত পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ইহাতে বহু নূতন চিত্র দেওয়া হইয়াছে যাহা ইতি-পূর্ব্বে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হস্তাক্ষর, কেশব সহ কেশব-গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাবসমাধি, শ্রীরামকৃষ্ণের তন্ত্রমতের সাধনস্থান বেলতলা, শ্রীশ্রীরামলালা মূর্ত্তি, যদুনাথ মল্লিকের উদ্যানস্থ যীশু ও মেরীর চিত্র, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজী, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের নানা চিত্র, কাশীপুর মহাশ্মশানের বেদী ও বিল্ববৃক্ষ, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের—চিত্রাবলী পাঠকপাঠিকার মনো-রঞ্জন ও কৌতূহল চরিতার্থ করিবে।

নূতন পুস্তক !

(১) দশাবতার চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য—মূল্য ৸৹ আনা।

(২) সাংখ্যদর্শন—কারিকা (বাংলা টীকাসহ) শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় ব্যারিষ্টার-এট্-ল প্রণীত মূল্য ২৲ টাকা।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী—(৫ম ভাগ) মূল্য ৷৵৹ আনা উদ্বোধন গ্রাহক পক্ষে ৷৹ আনা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসিয়া যে সব কথাবার্ত্তা শুনিতেন তাহা অনেকেই নিজ নিজ 'ডাইরীতে' লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণী শ্রীশ্রীমায়ের কথা শীর্ষক নিবন্ধে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের কল্যাণকর বিবেচনায় উহাই পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইল। পাঁচখানি ছবি সম্বলিত—বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর ৩৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

নূতন সংস্করণ

শ্রীরামানুজ চরিত

(২য় সংস্করণ)

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। ডিমাই আট পেজি ২৯৬ পৃষ্ঠা। সুন্দর মলাটযুক্ত। এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী পুঁথির পাটার মত নানা বর্ণে বিচিত্রিত। আচার্য্য রামানুজের জীবদ্দশায় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সূচী সম্বলিত। মূল্য ২৲ টাকা। গ্রাহকপক্ষে ১৸০ আনা।

ভক্ত্যাচার্য্য রামানুজের জন্মভূমি মান্দ্রাজ অঞ্চলে দীর্ঘকাল বাস ও মূলগ্রন্থ সকলের সহায়ে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ উক্ত আচার্য্যের অপূর্ব্ব জীবন, মত ও কার্য্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকের সমক্ষে প্রথম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সাতবর্ষব্যাপী পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে 'শ্রী'সম্প্রদায়ে প্রচলিত আচার্য্যের এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমাংশে গ্রন্থকার আচার্য্যাবলম্বিত বিশিষ্টাদ্বৈত মতাবলম্বী অতি প্রাচীন আচার্য্যগণের অপূর্ব্ব জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'গুরুপরম্পরা প্রভাব' নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি এমন তদ্ভাবভাবিত ও রসগ্রাহী হইয়া তুলিকা ধরিয়াছেন যে, বঙ্গসাহিত্যে আচার্য্যের পরিচয় দিবার ভার যে যোগ্য ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা গ্রন্থপাঠ কালে প্রতিপদে হৃদয়ঙ্গম হয়।